মনীষীদের জীবন থেকে

আতোয়ার রহমান

মনীষীদের জীবন থেকে

আতোয়ার রহমান

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

মনীষীদের জীবন থেকে
আতোয়ার রহমান
ইফাবা প্রকাশনা : ১৮৩২/১
ইফাবা গ্রন্থাগার : ৮০৮.০৮৬
ISBN : 984-06-0030-X

প্রথম প্রকাশ
জুন ১৯৯৫

দ্বিতীয় সংস্করণ
আষাঢ় ১৪০৮
রবিউল আউয়াল ১৪২২
জুন ২০০১

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রচ্ছদ
কৌশিক কাদের

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত)
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য : ৫০.০০ টাকা মাত্র

MONISHIDER JIBAN THEKE (Some Facts from the Life of Wise Men for Children): written by Atoar Rahman in Bangla and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. June 2001

Price : Tk 50.00 ; US Dollar : 2.00

মহাপরিচালকের কথা

মনীষীদের জীবন হচ্ছে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো। তাঁদের জীবনের আদর্শকে অনুসরণ করে আমাদের জীবন সুন্দর ও সমুজ্জ্বল হতে পারে। তাঁদের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা মানুষের জীবনের পথযাত্রায় হয়ে ওঠে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়।

বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক আতোয়ার রহমান এ রকম আটজন মনীষীর জীবনের কিছু ঘটনা ছোটদের উপযোগী করে খুব সহজভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন এই বইতে। বইটি শুধু ছোটদের নয়, বড়দেরও ভালো লাগবে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রাক্কালে আল্লাহ্‌র কাছে শোকর গুজারী করছি।

মওলানা আবদুল আউয়াল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

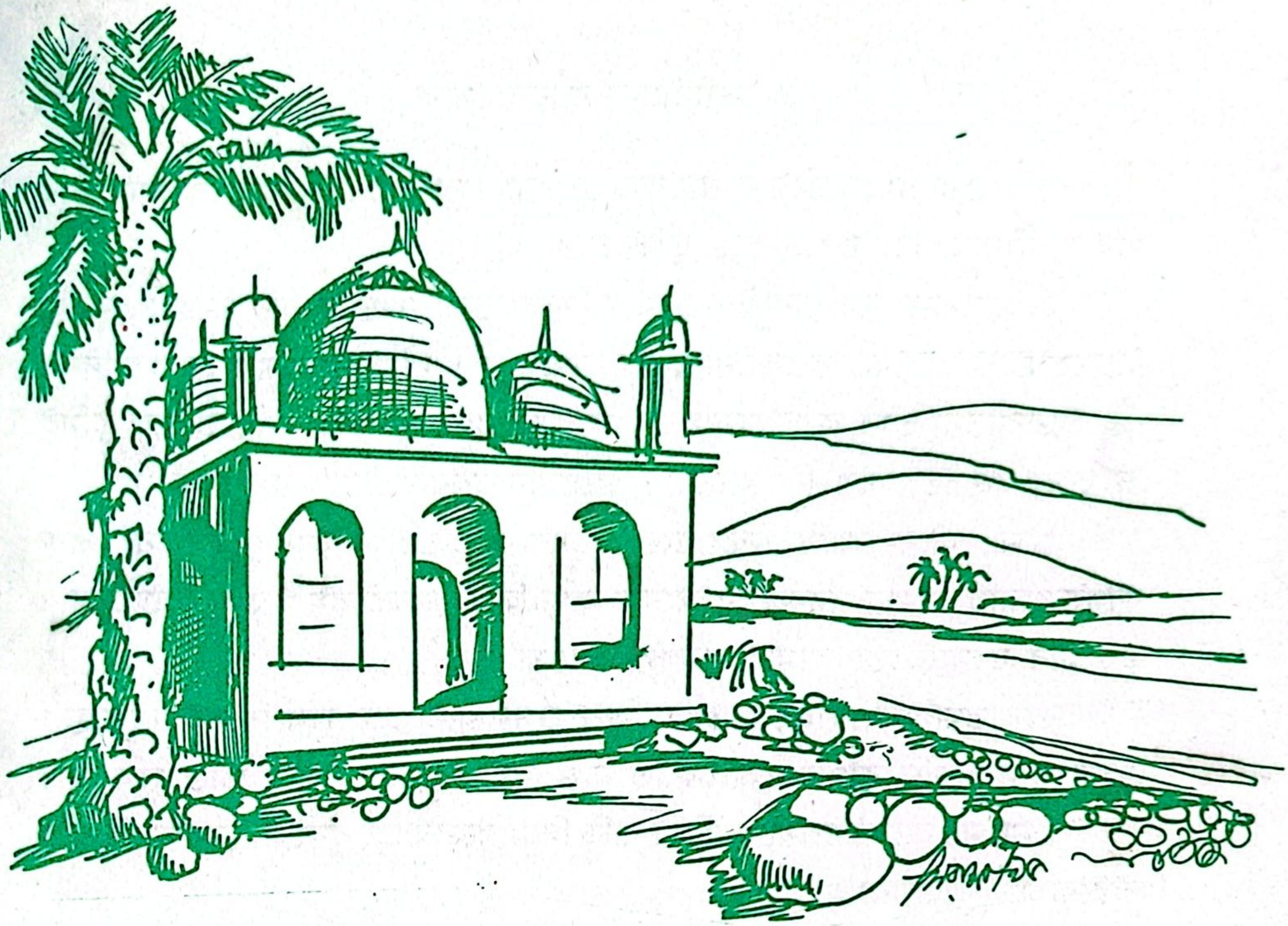
অনুসরণ করা শিশুদের সহজাত প্রবৃত্তি। অনুসরণ এবং অনুকরণ করেই একটি শিশু ক্রমশ বেড়ে ওঠে ও এক সময় পরিপূর্ণ মানবে পরিণত হয়। এই বই সেই উদ্দেশ্যে শিশুদের জন্যে আটজন মনীষীর জীবনের কিছু ঘটনা নিয়ে রচিত। বইটির নাম তাই রাখা হয়েছে 'মনীষীদের জীবন থেকে'।

লেখক আতোয়ার রহমান বাংলাদেশের শিশু সাহিত্যে একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর হাতে বইটি সহজ ও সাবলীল ভাষায় শিশুদের জন্য উপযোগী করে রচিত হয়েছে। কেবল শিশু-কিশোররাই নয়, বড়রাও বইটি থেকে উপকৃত হবে — আশা করি।

বইটি যাদের উদ্দেশ্যে লেখা তাদের উপকারে এলেই আমাদের ভাল লাগবে। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো। আল্লাহ্ হাফেজ।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ

সূচিক্রম



জানতে হলে বুঝতে হবে

আজ থেকে ন'শো বছরেরও কিছু আগের কথা।

বছর বিশেক বয়সের এক ছাত্র । ইরানের গুরগাঁত্ত শহর থেকে লেখাপড়া শেষ করে জন্মস্থান তুস শহরে ফিরছেন । কিন্তু একা নয়, এক দল লোকের সাথে। সেকালে একা দূরের পথ চলা ছিলো ভয়ানক বিপজ্জনক । প্রায়ই ডাকাতের হামলায় জানমাল খোয়াতে হত । লোকে তাই দূরের পথে চলাফেরা করতো দল বেঁধে, যাতে ডাকাতের হামলায় পড়তে না হয় ।

কিন্তু কাণ্ড দেখ, যার জন্যে ছাত্রটির অন্য লোকের দল ধরা, সেই ব্যাপারটাই ঘটে যায় । মানে— তাঁদের দলে ডাকাত পড়ে । তারপর যা হওয়ার, তাই হয় । দলের লোকজন জানে বেঁচে যায় বটে, কিন্তু ডাকাতরা তাদের সর্বস্ব কেড়ে নেয় । অনেক চেষ্টা করেও তারা ডাকাতদের ঠেকাতে পারে না ।

ডাকাতি সেরে ডাকাতরা আপন পথে রওনা দেয় । এদিকে, পথিক দলটির লোকজন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ।

শুধু একজন ছাড়া । সেই ছাত্রটি । তিনি ডাকাত দলটির পেছনে পেছনে দৌড়াতে থাকেন । সেই সঙ্গে চলে ডাকাডাকি, দোহাই—আমার একটা কথা আপনারা শুনে যান ।

ডাকাতরা প্রথমে তাঁর কথায় কান দেয় না। তারপর এক সময় কি যেন ভেবে থমকে দাঁড়ায়, কি বলতে চাও তুমি ?

ঃ আপনারা তো চান টাকা-পয়সা, মালমাত্তা। কিন্তু আমার কাছ থেকে যা নিয়েছেন, তা আপনাদের কোনো কাজে লাগবে না। ওগুলো আমাকে ফেরত দিন।

ডাকাতরা তাঁর কথা শুনে হাসে, কাগজ ! অকাজের জিনিস ! তাহলে তুমিই বা ওসব ফেরত নিয়ে কি করবে ? ওগুলোর জন্যে এতো দরদ কেন ?

ঃ না, মানে, আমি গুরগাঁওতে পড়াশোনা করতাম কিনা ! সেখান থেকে কাগজগুলোয় আমার দরকারের অনেক কথা লিখে এনেছিলাম। জ্ঞান-বিজ্ঞানের। এগুলোর জন্যেই তো আমার গুরগাঁও যাওয়া।

ডাকাতরা আবার হাসে, তাতে কি ? এসব কথা তো তুমি শিখেই নিয়েছো। এখন আমরা যদি কাগজগুলো ফেরত নাও দিই, তোমার কোনো ক্ষতি হবে না।

ঃ না, না, আমার শেখা হয়নি। বাড়ি গিয়ে পড়ে আগে বুঝবো, তবে না শিখতে পারবো।

ঃ তার মানে, এসব তুমি না বুঝেই এতো খাটনি করে লিখে এনেছো ! গুরগাঁওয়ে ওস্তাদদের কাছে বুঝে নাওনি ? এখন কোথাও আটকে গেলে তোমাকে বুঝিয়ে দেবে কে ?

ছাত্রটি এবার লা-জওয়াব। তিনি মনে মনে স্বীকার করলেন, ডাকাতরা একেবারে মিথ্যে বলেনি। এমনও তো হতে পারে যে, লেখা জিনিসগুলোর কিছুই তিনি বুঝতে পারছেন না। তখন তাঁর সব মেহনত বরবাদ যাবে।

সুতরাং অমন কর্ম আর নয়। তিনি ডাকাতদের আর কিছু বলেন না। শুধু মনে মনে একটা কসম করেন ঃ যাই তিনি শিখতে বা লিখতে চান, সেটা আগে ভালো করে বুঝে নেবেন।

আমিও তোমাদের বলি, হ্যাঁ, অমন কর্ম আর নয়। তোমাদের অনেকেই ক্লাসে স্যারদের পড়ানোর সময় এটা-ওটা 'নোট' করে নাও; পরে কাজে লাগতে পারে, এই ভেবে। কিন্তু পরে হয়তো দেখলে, নোট করা জিনিসটার কিছুই মাথায় ঢুকছে না। তখন ? ক্লাসেই যদি স্যারদের কথাগুলো তোমরা ভালোভাবে বুঝে নাও, তাহলে তোমাদের নিশ্চয়ই এমন দশায় পড়তে হবে না।

তা—সবই তো বুঝলাম। কিন্তু যাঁকে নিয়ে এতো কথা, সেই ছাত্রটি কে ? তাঁর পরিচয় কি ?

তাঁকে অবশ্যি তোমরা চেনো। আর কিছু না হোক, অন্তত নামে। তিনি হচ্ছেন ইমাম গাযালী। দুনিয়ার সবচেয়ে বড়ো আর নামকরা দার্শনিকদের একজন।

ইমাম গাযালীর পুরো নাম ছিলো আবু হামিদ ইবনে মুহাম্মদ আলী গাযালী। তাঁর জন্ম হয় ১০৫৮ খৃস্টাব্দে। আর, তিনি মারা যান ১১১১ সালে। তাঁর বাড়ি ছিলো পারস্যের—মানে, একালের ইরানের তুস শহরে। দার্শনিক বললে আমরা বুঝি খুব জ্ঞানী মানুষ। যিনি অন্যের কাছ থেকে যেমন শেখেন, তেমনি নিজে চিন্তা করে নিজের বুদ্ধি দিয়েও শেখেন। আর এই শেখবার জন্যে তাঁদের আগ্রহ থাকে দারুণ। ইমাম গাযালীর সবচেয়ে বড়ো গুণ ছিলো ওইটি—শেখবার আগ্রহ। সেই সঙ্গে অতি প্রখর বুদ্ধি। ওই সব দিয়ে তিনি সারা জীবন সত্যের সন্ধানে ফিরেছেন। আর এর জন্যে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কতো কষ্ট যে সহ্য করেছিলেন, তার কোনো হিসেব নেই।

সেই কষ্টের ফলও তিনি রেখে গেছেন। দুনিয়ার সবার জন্যে, বইয়ের আকারে। সে এক পিলে চমকানো ব্যাপার।

রবিনসন ক্রুসোর গল্প ছোটদের সবারই বড়ো আদরের জিনিস। যাঁরা বয়স্ক পাঠক, তাঁদেরও। তার কারণ, বইখানা মানুষকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে সাহস এবং উৎসাহ যোগায়। এই কথা বলে যে, ইচ্ছা, চেষ্টা আর মেহনত দিয়ে অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারে। এমনি দারুণ শিক্ষামূলক বইখানার লেখক ড্যানিয়েল ডিফো। তাঁর আর এক দারুণ কীর্তি, তিনি বই লিখেছিলেন দু'শো খানা। একালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপরে টেক্কা দিয়ে লেখেন প্রায় তিনশো খানা বই। এসব হল আধুনিক কালের কথা। যখন পড়বার, বই লেখবার, ছাপাবার সুযোগ প্রায় অফুরন্ত। কিন্তু আজ থেকে প্রায় সাড়ে ন'শো বছর আগে, যখন এ সবের সুযোগ ছিলো অতি সামান্য—ছাপাবার সুযোগ তো ছিলোই না—সেই আমলে ইমাম গাযালী কি পরিমাণ লিখেছিলেন, জানো? শুনলে মাথা ঘুরে যাবে। জন্মের তারিখ থেকে মৃত্যুর দিন এক হিসেব ধরলে, গড়ে দৈনিক চৌদ্দ পৃষ্ঠা করে।

অথচ তাঁর জীবনে এমন একটা সময় ছিলো, যখন দুটো খেয়ে-পরে বেঁচে থাকবার আশাও ছিলো কম।

সে আর এক অবাক করা ব্যাপার।

গাযালী যখন খুব ছোট, তখনই হয়ে যান এতিম। বাবা-মা ইন্তিকাল করেন প্রায় একই সময়ে। খাওয়া-পরার জন্যে চিন্তা-ভাবনার বয়স তখন তাঁর নয়। তবু ওসব এমনি জিনিস, যেগুলোর জন্যে কেউই না ভেবে পারে না।

ভাবলেন গাযালীও। কি খাবেন, কি পরবেন, কোথায় থাকবেন, এই সব।

তাঁর যখন এমনি বিপদ, তখন এগিয়ে এলেন,—না, এসব সময়ে যাঁরা আসেন, সেই আত্মীয়-স্বজনদের কেউ নয়। আসেন তাঁর বাবার এক বন্ধু। তাঁকে কোলে তুলে নিয়ে বলেন, 'ভয় কি বাবা? তোমার আব্বু-আম্মু নেই, তাতে কি

হয়েছে ? আমি তো আছি ।'

তিনি গাযালীর সব ভার নিয়ে নেন ।

এর পর থেকে গাযালী তাঁর বাড়িতেই থাকেন। থাকতে থাকতে—এক সময় লেখাপড়া শেখবার বয়স হয় তাঁর । তখন তাঁর ওলী-অভিভাবক সঙ্গে সঙ্গে তাঁর লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে ফেলেন । আর সেই ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে গাযালী নিশ্চিন্ত মনে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে থাকেন । পড়াশোনায় আগ্রহ ছিলো তাঁর গভীর। বলতে গেলে নেশার মতো। তাই যে জিনিস শিখতে অন্য ছাত্রদের হয়তো লাগে দু'বছর, গাযালী তা শিখে ফেলেন এক বছরে । তার ফলে অল্প বয়সেই লেখাপড়ায় তিনি এগিয়ে যান অনেক দূর। তাঁর একটা সুযোগও ছিলো দারুণ, একটা ভালো প্রতিষ্ঠানে পড়বার। তুস শহরের নিজামিয়া মহাবিদ্যালয়ের তখন ভারী নামডাক। গাযালীকে তাই দূরে যেতে হল না, বাড়িতে থেকেই পড়াশোনা করলেন সেই নামকরা মহাবিদ্যালয়ে ।

কিন্তু—ওই যে বলছিলাম, পড়াশোনায় তাঁর আগ্রহ ছিলো নেশার মতো । তাই নিজামিয়া মহাবিদ্যালয়ে তাঁর বেশি দিন পোষায় না । তাঁর আরো ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চাই, আরো উচ্চশিক্ষা চাই ।

তা—সেসব কোথায় মেলে ?

মেলে অবশ্যি দেশের ভেতরেই । ইরান তো তখন জ্ঞানবিদ্যায় অনেক উন্নত । গাযালী খোঁজখবর নিয়ে জানতে পান, তাঁর যা শেখবার সাধ, দুটি জায়গায় গেলে তা শেখা যেতে পারে । দু'জায়গাতেই বড়ো বড়ো অনেক গুণী-জ্ঞানী ওস্তাদ আছেন । জায়গা দুটি হল নেশাপুর আর গুরগাঁও ।

গাযালী আর দেরি না করে ছুটে গেলেন—প্রথমে নেশাপুরে, তারপর গুরগাঁওয়ে। এই দুটি জায়গায় তিনি লেখাপড়া শেখেন, তখনও তাঁর বয়স বিশ বছর পেরোয়নি। কিন্তু তারই মধ্যে চারদিকে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে মস্তো বড়ো বিদ্বান বলে ।

তাঁর এই নাম ছড়ানোর একটা কারণ অবশ্যই ছিলো— ছাত্র হিসেবে তাঁর ভালো হওয়া । আর একটি কারণ কিছুক্ষণ আগেই বলেছি, তাঁর লেখা বইপত্তর । সেসবও তিনি লিখতে শুরু করেন তরুণ বয়সেই । আর ওই বয়স থেকেই লেখক হিসেবে বড়ো বড়ো গুণী-জ্ঞানীরও মন কেড়ে নেন ।

অথচ সেটা ছিলো তাঁর সাধনা কালের শুরু। তারপর থেকে তিনি দিনের পর দিন এগিয়ে গেছেন উন্নতির পথে। তখন যে তিনি লিখতেন প্রায় দু'হাতে, তার আভাস তোমাদের আগেই দিয়েছি ।

তা—লিখতেন কি তিনি ?

সে কি এক-আধটা জিনিস ? আগে শুনেছো, তাঁকে বলা হয় পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো দার্শনিকদের একজন । তাই বলে তিনি শুধু দর্শন নিয়ে মাথা ঘামাননি । জানবার নেশা তাঁর মনটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে নানান দিকে । তার ফলে ধর্ম, গণিত, জ্যোতিষ শাস্ত্র, এসব বিষয়েও তিনি হয়ে ওঠেন দারুণ পণ্ডিত । আর এসব নিয়ে বই লিখেছিলেন প্রায় অগুনতি ।

দুঃখের বিষয়, তাঁর সব বই এখন পাওয়া যায় না । এমনকি সব বইয়ের নামও । কিন্তু তাঁর যেখানি সেরা কীর্তি, সবচেয়ে নাম করা বই, সেখানি পড়বার সুযোগ আছে লোকের এখনো । আকারে বিশাল এই বইখানার নাম 'কিমিয়া-এ-সা'দাৎ' । ইসলাম ধর্মের নানান বিষয় নিয়ে লেখা । খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, বিস্তারিতভাবে প্রতিটি বিষয়ের নানারকম ব্যাখ্যা দিয়ে । কেউ কেউ এমন কথাও বলেন, কুরআন শরীফ যদি কোনো দিন দুনিয়া থেকে হারিয়ে যায়, তাহলে এই বইখানাই ইসলাম ধর্মকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে । বইখানার বাংলা অনুবাদও হয়েছে, 'সৌভাগ্যের পরশমনি' নামে ।

এমন যে পণ্ডিত আর গুণী মানুষ, মনের দিক থেকে তিনি ছিলেন ভারী সরল । অহঙ্কারের নামগন্ধও দেখা যায়নি তাঁর ভেতর । তিনি বরং সম্মান, প্রশংসা, এ সবকে ভয় করে এড়িয়েই চলতেন । তাঁর ধারণা ছিলো, ও দুটি জিনিস মানুষের উন্নতির পথে বাধা ।

এই নিয়ে একবার এক বিচিত্র ব্যাপার ঘটে ।

গাযালী তখন দেশভ্রমণে বেরিয়েছেন— এদেশ থেকে সেদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন । বেড়াতে বেড়াতে একদিন একটি মসজিদের কাছে এসে হাজির হন । মসজিদের ইমাম সাহেব তখন ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন । গাযালী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর কথা শুনতে থাকেন ।

বক্তৃতা শেষ করবার সময় ইমাম সাহেব বলেন, আপনারা এতোক্ষণ যা শুনলেন, তা ঠিক আমার কথা নয় । এসব হচ্ছে আমাদের সবার শ্রদ্ধার পাত্র ইমাম গাযালীর কথা । তিনি যা বলেন, আমরা সবাই তা মেনে নিই ।

গাযালী বাইরে থেকে কথাগুলো শুনে ভারী লজ্জা পেয়ে যান । মনে মনে বলেন, এমন ধরনের প্রশংসায় কার না আনন্দ হয় ? কিন্তু এ আনন্দ তো বিষ। এরই থেকে তো জন্ম নেয় সর্বনাশের মূল অহংকার । এখানে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়।

ইমাম গাযালী অনেক দেশ ভ্রমণ করেছিলেন । শুধু লেখাপড়া শেখার জন্যে

নয়, পর্যটক হিসেবেও মুসলমানদের সবকটি ধর্মীয়স্থানেই তিনি গিয়েছিলেন । শুধু কি তা-ই ? আগেই তো শুনেছো, তাঁর জানবার আগ্রহ ছিলো নেশার মতো । তাই এটা-ওটা দেখে জ্ঞান লাভের জন্যেও তিনি ঘুরে বেড়াতেন । তাঁর কথা ছিলো, দুনিয়ার প্রত্যেকটি জিনিস থেকেই আমরা জ্ঞান লাভ করতে পারি । নদীতো তরল বই । আর নুড়ি-পাথর হচ্ছে নসিহত ।

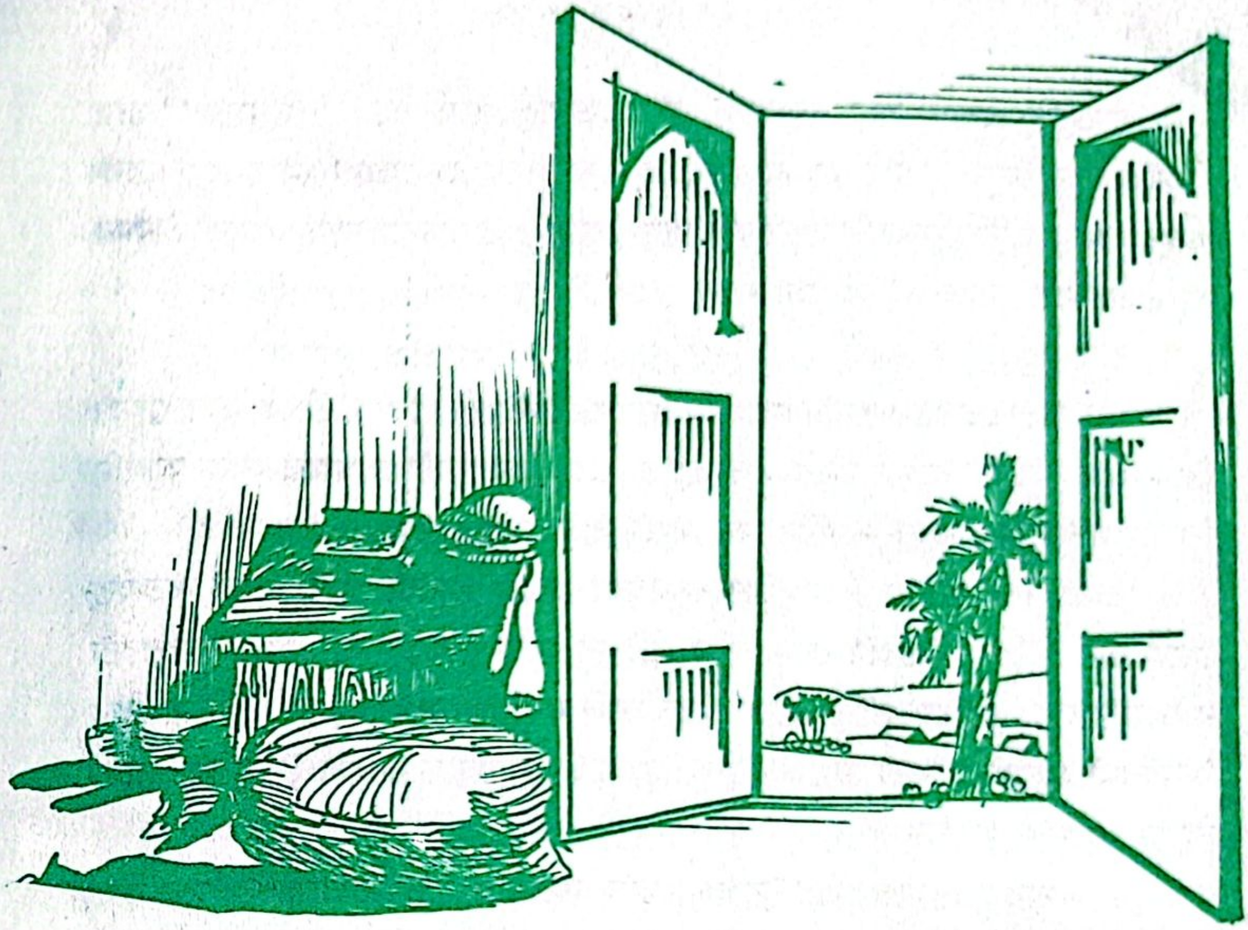
মাত্র একুশ বছর বয়সে তিনি তুসের নিজামিয়া মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক হয়েছিলেন । কিন্তু চাকরিটা তাঁর ভালো লাগতো না । তাই কিছু দিন পরই অধ্যাপনা ছেড়ে দেন । তারপর আপন মনে ভাবনা-চিন্তা, সে আমলের বড়ো বড়ো পণ্ডিতের সাথে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা আর পড়াশোনা ।

সুলতানের চাপে পড়ে তিনি অবশ্য আর একবার অধ্যাপক হয়েছিলেন । অনেক দিন পর! কিন্তু সেবারও চাকরিতে বেশি দিন লেগে থাকেননি । চাকরি বাকরি তাঁর সেখানেই শেষ ।

দেশ ভ্রমণের সময় একবার তিনি হেবরোনে যান । সেখানে এক মাযারের পাশে দাঁড়িয়ে কসম করেন, জীবনে কারো কাছ থেকে বৃত্তি বা মাসোহারা নেব না, কোনো তর্কের ব্যাপারের মধ্যে যাবো না, কোন রাজদরবারেও যাবো না ।

এমন মানুষ কয়জন মেলে ?





তোমার কীর্তির চেয়ে—

এক ডাক্তার। কোন এক হাসপাতালের বড়কর্তা।

হাসপাতালের সেদিনকার কাজকর্ম সেরে বাসায় ফিরবেন বলে বেরিয়েছেন। সামনে তাঁর গাড়ি অপেক্ষা করছে। তিনিও উঠতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ওঠেন না। চোখ পড়েছে কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা একটি মেয়ের দিকে। বছর পনের বয়স। বোধ হয় এখনো স্কুলের সীমা পেরোয়নি। এ বয়সের মেয়ের মুখ ঝলমলে হওয়ার কথা। কিন্তু তার বদলে দেখাচ্ছে মলিন।

বড় কর্তা তাকে স্নেহের সুরে ডাক দিয়ে শুধান, মা তোমার কি হয়েছে ? হয়েছে যে— এই। ডায়াবেটিস— বহুমূত্র রোগ। যা আজও, বিজ্ঞানের এই চোখ কপালে-তোলা অগ্রগতির যুগেও— একেবারে সারে না।

বড় কর্তা বলেন, এর জন্যে ভাবনা কি ? তুমি নিশ্চয়ই এখানকার ডাক্তার সাহেবদের দেখিয়েছো। তাঁরাই তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন।

ঃ হ্যাঁ। কিন্তু—

ঃ এর মধ্যে আর 'কিন্তু'-র কি আছে মা ?

মেয়েটি এবার তার সমস্যার কথা একটু খুলে বলে। সমস্যাটা তার প্রেসক্রিপশন নিয়ে। তাতে যেসব ওষুধের নাম আছে, সেগুলো কিনতে শ পাঁচেক টাকা লাগবে। কিন্তু মেয়েটির পরিবার বড়ো, আয় তার তুলনায় কম। এতো টাকার ওষুধ কিনতে গেলে বাড়ির লোকজন খাবে কি ?

ঃ ও।

বড় কর্তা প্রেসক্রিপশনটা দেখেন। তারপর সেটা যাঁর লেখা, তাঁকে খবর দেন। তিনি এলে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা এই প্রেসক্রিপশনটা লেখবার আগে আপনি কি মেয়েটির সব কথা—পরিবারের কথা শুনেছিলেন, ডাক্তার সাহেব ?

প্রশ্নটা বড় কর্তার। প্রেসক্রিপশন-লেখা ছোটো ডাক্তার তাই একটু থতমত খেয়ে যান। কিন্তু উত্তরটা দেন সত্যি, জী না স্যার। বড় কর্তা তখন ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলেন, এই মেয়েটির জন্যে এতো দামী দামী ওষুধের ব্যবস্থা না দিয়ে কিছু কম দামী ওষুধের ব্যবস্থা দেওয়া উচিত ছিলো। ওষুধের বাকি কাজটুকু সারা যেতো বিশেষ পথ্যের মাধ্যমে।

ঃ আমার ভুল হয়ে গেছে, স্যার। মাফ করুন। ভবিষ্যতে রোগীর সব কথা শুনে প্রেসক্রিপশন লিখবো। এটা এখনই ঠিক করে দিচ্ছি।

বড় কর্তা আবার মেয়েটির দিকে ফিরলেন, এবার তোমার ভাবনা মিটেছে তো মা ? না, বোধ হয় মেটেনি। তোমার চিকিৎসা চালাতে গেলে তোমাদের সংসারের একটু কষ্ট হবে। তার জন্যে ভেবো না। আর তুমি এখন পড়াশোনা করো তো ?

মেয়েটি চুপ করে থাকে।

ঃ বুঝেছি। ঠিক আছে। তারও ব্যবস্থা হবে। তোমার লেখাপড়ার ভারও আমিই নিলাম।

তা কে ভার নিলেন ? কার এতো কথা ?

তাঁকে তোমরা সবাই চেনো। না দেখলেও অন্তত তাঁর নামটা জানো। তিনি আমাদেরই দেশের একজন মহাপুরুষ। কিছু দিন আগেও আমাদের মধ্যে ছিলেন। তাঁর নাম ডাঃ মোহাম্মদ ইব্রাহিম। শাহ্‌বাগের মোড়ে তোমরা যে বিশাল ডায়াবেটিক হাসপাতালটা দেখো, তিনিই ছিলেন তার প্রতিষ্ঠাতা।

কিন্তু শুধু এটুকু বললে তাঁর আসল পরিচয় দেওয়া হয় না।

সাধারণভাবে বাংলাদেশের মানুষ তাঁকে চেনে একজন নামকরা ডাক্তার হিসেবে। ভালো ডাক্তার বলে বিদেশেও তাঁর খ্যাতি ছিলো। এদিকে চিকিৎসা শাস্ত্র আর পুষ্টিবিজ্ঞান নিয়ে তিনি প্রচুর গবেষণা করেছেন। সেই সঙ্গেই মেতে থাকতেন সমাজসেবা নিয়ে।

কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা, তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে একজন মানবদরদী। রুগ্ন মানুষের বিশেষ করে বহুমূত্র রোগীদের সেবায় তিনি তাঁর অবসরের সবটুকু সময়, সবটুকু শক্তি বিলিয়ে দিয়েছেন। সে যে কেমন বিলানো, ওপরের ঘটনাটি থেকেই তোমরা তার আভাস পাবে।

ডাঃ মোহাম্মদ ইব্রাহিমের জীবন কাহিনীতে এমন ঘটনা আমরা অবশ্যি কেবল এই একটিই পাই না। আরো অনেক আছে। যেমন—

হ্যাঁ, সে অন্য একবারের কথা। আর অন্য একটি মেয়েকে নিয়ে। এই মেয়েটিরও অল্প বয়সে ডায়াবেটিস হয়েছিলো। আর ডাঃ ইব্রাহিম তারও আগের মেয়েটির মতো চিকিৎসা আর পড়াশোনার ব্যবস্থা করেন।

কিন্তু এবারে তাঁর কাজ সেখানেই শেষ হয়নি।

মেয়েটি পড়াশোনা করতে করতে বি, এ,, পাস করে।

এরপর আসে তার জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পালা।

বুঝতেই পারছো, ডাঃ ইব্রাহিমের সাথে তার বরাবরই যোগাযোগ ছিলো। সে বি, এ, পাস করবার পর একদিন তিনি তাকে শুধান, এবার কি চাও ? চাকরি-বাকরি ?

ঃ পেলে তো ভালোই হয়। কতো দিন আর আপনাকে কষ্ট দেব ?

ঃ আচ্ছা, দেখি।

আগের মেয়েটি ছিলো ঢাকার। এটি খুলনার। ডাঃ ইব্রাহিম তার সাথে কথা বলবার পর খুলনার জেলা প্রশাসককে ফোন করলেন, এই ব্যাপার। মেয়েটার একটা গতি হয় না ?

জেলা প্রশাসক তাঁর মতো মানুষকে সরাসরি 'না' বলতে পারেন না। জবাবে তাঁরই মতো শুধু বলেন, দেখি।

দিন কয়েক পরই ডাঃ ইব্রাহিম আবার ফোন করেন জেলা প্রশাসককে। তিনিও আবার শুধু বলেন, দেখি।

করে করে—বেশ কিছু দিন চলে যায়। কিন্তু ডাঃ ইব্রাহিম ধৈর্য হারান না। আর জেলা প্রশাসক—বলতে গেলে অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত মেয়েটিকে একটি চাকরি জুটিয়ে দেন।

এই নাছোড়বান্দা দরদী মানুষটির জন্ম হয় অবিভক্ত বঙ্গদেশের—এখনকার পশ্চিম বাংলার মুর্শিদাবাদ জেলায়। তার ভরতপুর এলাকার খাড়েরা নামে একটি গ্রামে। ১৯১১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর।

শিশু ইব্রাহিম একটু বড় হন, লেখাপড়ায় তাঁর হাতেখড়ি হয়। প্রথম জীবনের পড়াশোনা তিনি শেষ করেন নিজের জেলাতেই। তারপর ডাক্তারি পড়তে যান কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে।

ডাক্তারি পাস করবার পর তাঁর চাকরি জুটে যায়, ওই কলেজেই। সেটা ১৯৩৮ সালের কথা। যখন বঙ্গদেশে মুসলিম এম, বি, (এখনকার বাংলাদেশের এম, বি, বি, এস,) ডাক্তার পাওয়া যেতো খুবই কম।

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে আর হাসপাতালে তিনি ১৯৪৫ সাল অবধি কাজ করেন হাউস ফিজিসিয়ান, ইমার্জেন্সি অফিসার আর প্র্যাকটিক্যাল ফার্মেসির সিনিয়র ডেমনাস্ট্রেটার হিসেবে।

সেই তাঁর কর্মজীবনের শুরু। আর্তজনের সেবায় গিয়ে ক্রমে ক্রমে তাদের অকৃত্রিম বন্ধু হয়ে ওঠারও।

সে এক লম্বা কাহিনী। তার সবটুকু বলতে গেলে আলাদা একখানা বই লিখতে হবে। এখনকার মতো শোনো সংক্ষেপে কয়েকটি কথা।

সেই যে ১৯৩৮ সালে তিনি ঢুকেছিলেন মেডিক্যাল কলেজ আর হাসপাতালের চাকরিতে, নানান জায়গায় ঘুরে, নানান পদ ছুঁয়ে তা শেষ হয় ১৯৭১-এ। এর মধ্যে তিনি ধাপে ধাপে কেবলই ওপরে উঠেছেন। অবসর যখন নেন, তখন ছিলেন করাচীর জিন্নাহ্ পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল সেন্টারের পরিচালক এবং মেডিসিনের অধ্যাপক। এই পদটিতে তিনি কাজ করেন বছর সাতেক। ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৭ সাল অবধি।

আর এরই মধ্যে করেছেন নানান কাণ্ড। কিছু-বা এর পরও। কখনো ডাক্তারী পেশার পড়াশোনা, কখনো গবেষণা, কখনো-বা বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠান পরিচালনা।

তোমরা বোধ হয় জানো, ডাক্তারির দুনিয়ায় এফ, আর, সি, পি, ডিগ্রীটা ভারি দামী। পড়াশোনা করে ডাঃ ইব্রাহিম এই ডিগ্রী প্রথম পান ১৯৫০ সালে, আমেরিকা থেকে। তারপর আরো দু'বার। ১৯৬৭ সালে লণ্ডন আর ১৯৭৮ সালে গ্লাসগো থেকে।

এ ছাড়া ফেলো হয়েছেন তিনি দুটি বড়ো প্রতিষ্ঠানের। পাকিস্তান আর বাংলাদেশের কলেজ অব ফিজিসিয়ানস্ এ্যাণ্ড সার্জন্‌সের। আর হয়েছেন জর্ডানের রাজধানী আম্মানের ইসলামী বিজ্ঞান একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা ফেলো।

আবার তিনি ছিলেন পাকিস্তান মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, পাকিস্তান ডায়াবেটিক এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি এবং পাকিস্তান ন্যাশনাল

সায়েন্স কাউন্সিলের চেয়ারম্যানও ।

এমনি আরো কতো কি ! যেগুলোর সঙ্গে চলেছে তাঁর অক্লান্ত সমাজ সেবা। তাঁর সরকারী চাকরির মেয়াদ ফুরোয় ১৯৭১ সালে ।

তাঁর সবচেয়ে বড় কীর্তি—সারা জীবনের স্বপ্নের ফল—শাহ্‌বাগের মোড়ের সেই হাসপাতালটি । সাধারণ লোকে যাকে বলে ডায়াবেটিক হাসপাতাল আর খাতাপত্রে যার নাম—একটা লম্বা ইংরেজি নামের শব্দগুলির প্রথম অক্ষরগুলো নিয়ে তৈরি 'বারডেম' ।

ডাঃ ইব্রাহিম বলতেন, রোগ-বালাই হলে সব লোক ডাক্তারের কাছে যায় না । সব রোগের জন্যে তো নয়ই । যেগুলির জন্যে যায়, সেগুলি থেকে সেরে উঠলেও আর যায় না । কিন্তু সব রোগ কি সারে ? যেমন ক্যান্সার, গেঁটেবাত আর বহুমূত্র ? এসবের চিকিৎসার জন্যে মানুষকে ডাক্তারের কাছে যেতেই হয় । যতো দিন মৃত্যু না আসে, ততো দিন । আর এমনি লম্বা চিকিৎসায় ওষুধ-পত্তর, ডাক্তারের ফীস ইত্যাদিতে পয়সাও লাগে প্রচুর । তার ওপর আছে দুর্ভোগ। এসব রোগের রোগীদের কি একটু সাহায্য করা যায় না ?

তিনি ঠিক করলেন, বহুমূত্র রোগীদের একটু সেবা করবেন । একটি হাসপাতাল খুলে । এবং সেখানে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে ।

টাকা নিয়ে চিকিৎসা তিনি অবশ্যি এমনিতেও কোন দিনই করেননি । বিদ্যায়, অভিজ্ঞতায় তাঁর থেকে ছোট অনেক ডাক্তার প্র্যাকটিস চালিয়ে লাখ লাখ টাকা কামান। ডাঃ ইব্রাহিম প্র্যাকটিস করলে কামাতে পারতেন হয়তো কোটি টাকা। কিন্তু ওই পথেই তিনি যাননি। তিনি তো টাকা চাননি, চেয়েছেন মানুষের সেবা করতে।

তাঁর কাছে কোন রোগী গেলে তিনি বলতেন, আমাকে আপনার সেবা করবার সুযোগ দিলেন, এর জন্যে ধন্যবাদ । যাঁরা তাঁর মনটাকে চিনতেন না, তাঁরা অবাক হয়ে যেতেন । ডাক্তার তো পয়সার জন্যেই চিকিৎসা করেন । এর মধ্যে সেবা আর ধন্যবাদের কথা আসে কিভাবে ? তারপর, তাঁর আসল পরিচয় জেনে তাঁরা আর একবার অবাক হয়েছেন ।

বহুমূত্র রোগীদের জন্যে খোলা তাঁর হাসপাতালটাও এক অবাক করবার মতো ব্যাপার । এটির জন্ম হয় সেগুনবাগানে । টিনের শেডে, তাঁর নিজের চেম্বারে, ১৯৫৬ সালে । আর মাত্র চৌত্রিশজন রোগী নিয়ে । এখন শাহ্‌বাগের হাসপাতালে এক-এক দিনই শত শত রোগী !

ডাঃ ইব্রাহিম চেয়েছিলেন তাঁর টিনের চালার হাসপাতালটি নিয়ে যাবেন

রাজারবাগে। তাও নিজের জায়গায় । সেখানে তিনি কিনে রেখেছিলেন তিন একর জমি, হাসপাতালের পাকা বাড়ি তৈরির জন্যে । কিন্তু স্বাধীনতার পর জমিটা হাত ছাড়া হয়ে যায় । আর তার বদলে তিনি পান শাহ্বাগের মোড়ে মাত্র এক একর জমি । অবস্থানের গুণে এক একরেই তাঁর ক্ষতিটা পুষিয়ে যায় । আর তিনি চেয়েছিলেন হাসপাতালের ছড়ানো জায়গায় তুলতে । সে ইচ্ছেটা মেটে উঁচু দালান করে । তোমরা শাহ্বাগের হাসপাতালের সামনের বাড়িটা দেখতে পাও মাত্র কয়েক তলার । কিন্তু পেছন দিকের জাতীয় সম্প্রচার কেন্দ্রের পাশের বাড়িটা হচ্ছে চৌদ্দ তলা । হাসপাতালটির জন্যে সারা বাংলাদেশ গর্বিত ।

এই হাসপাতাল তৈরি হয়েছে তাঁর জমির ওপর । তবে বাড়ি তৈরির খরচ দিয়েছেন সরকার । হাসপাতালে চিকিৎসার জন্যে একটি পয়সাও নেয়া হয় না ।

খুব বড়ো হাসপাতাল এটা নয় । কিন্তু সব দিক থেকে আধুনিক । এদিকে বহুমূত্র রোগ হলে মানুষের কিছু আনুষঙ্গিক রোগ দেখা দেয় । যেমন দাতের রোগ। ডাঃ ইব্রাহিম তাঁর হাসপাতালে বহুমূত্রের সাথে সাথে সে সব রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থাও করেছেন নিজের চেষ্টায় । এ ব্যাপারেও তিনি ছিলেন একজন খুব বড়ো সংগঠক ।

একটু আগেই তোমরা শুনেছো, এই হাসপাতাল 'বারডেম' ছিলো তাঁর সারা জীবনের স্বপ্ন। এটা গড়তে গিয়ে—আসলে রোগীর সেবা করতে গিয়েই তিনি আর সব কিছু ভুলে গেছেন তাঁর। রোগীকে একজন আর্ত মানুষ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেননি তিনি। সে কোন অপরাধ করলেও তাকে দেখেছেন দরদের চোখে, ক্ষমার চোখে ।

এরও প্রমাণ পাওয়া গেছে তাঁর বারডেমেই ।

সেবার—ডাঃ ইব্রাহিম তখন ঢাকার বাইরে—হাসপাতালের এক ডাক্তার আর এক সাধারণ কর্মচারীর মধ্যে বাধে ঝগড়া । আর সেই ঝগড়ার জের টেনে সাধারণ কর্মচারীটি ডাক্তার সাহেবকে বেদম মারপিট করতে থাকে । লোকজন ছুটে এসে না ঠেকালে তিনি হয়তো মরেই যেতেন । এমন মারপিট যিনি করেন, তিনি ক্ষমার অযোগ্য । তাঁকে ধরে পুলিশে দেওয়া হয় ।

পুলিশ তাঁকে হাসপাতালে পাঠায় । চাকরি থেকে তিনি সাময়িকভাবে বরখাস্ত হন । এদিকে তাঁর ছিলো বহুমূত্র রোগ। তাঁর চিকিৎসাও বন্ধ হয়ে যায় ।

এমনি সময় ডাঃ ইব্রাহিম ঢাকায় ফেরেন । এবং সব কথা শোনেন ।

শুনেই—হাসপাতালের কর্মকর্তাদের বলেন, দুঃখের বিষয়, আপনারা মনে রাখেননি, মারপিট যিনি করেছিলেন, তিনি রোগী । তাও আবার বহুমূত্রের । এমন

রোগীর কি সব সময় মাথা ঠিক থাকে ? এখন তিনি জেলখানায় ঢুকলে নিজে বিনা চিকিৎসায় মরবেন, তাঁর পরিবারের লোকজনও না খেয়ে মরবে ।

তারপর নিজে তদবির করে আসামীকে ছাড়িয়ে আনেন । শুধু তা-ই নয়, তাঁকে আবার চাকরিতেও বহাল করেন ।

মানুষের প্রতি এমনি দরদের জন্যে তিনি সম্মানও পেয়েছেন প্রচুর । নানা রকম পুরস্কারও ।

১৯৭৫-৭৭ সালে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে করেন উপদেষ্টা, মন্ত্রীর পদমর্যাদায় । সে সময়ে তিনি ছিলেন স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, শ্রম ও জনশক্তি আর সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ।

১৯৬৩ সালে পাকিস্তান সরকার তাঁকে দেয় 'সিতারা-এ-খিদমত' খেতাব । আর ১৯৭৯ সালে তিনি পান বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সম্মান—স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার । কয়েকটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও তাঁকে চিকিৎসা আর সমাজসেবার জন্যে পুরস্কার দিয়েছে । যেমন—বেগম জেবুন্নিসা ও কাজী মাহবুবউল্লাহ জনকল্যাণ ট্রাস্ট, মাহবুব আলী খান স্মৃতি সংসদ, কুমিল্লা ফাউণ্ডেশন আর খান বাহাদুর আহসানউল্লাহ্ স্মৃতি সংসদ ।

১৯৮৪ সালে তাঁকে করা হয় জাতীয় অধ্যাপক ।

এ সব সম্মান আর পুরস্কার দিয়ে মানুষ কিন্তু তাঁকে বড়ো করেনি । বরং নিজেরাই ধন্য হয়েছে । যিনি নিজেই বড়ো, তাঁকে আর বড়ো করবে কে ? আসলে তিনি নিজে মানুষ হিসেবে বড়ো ছিলেন বলেই মানুষের জন্যে অতো বড়ো বড়ো কাজ করতে পেরেছিলেন । ইসলাম বলে, মানুষের সেবার থেকে বড়ো ধর্ম নেই । ডাঃ ইব্রাহিম সেই ধর্মই পালন করে গেছেন । আমরা এখন তাঁর অমর কীর্তি বারডেম দেখে, নানারকম গবেষণা আর জনসেবার কাজের কথা শুনে মুগ্ধ হই । হ্যাঁ, সেসব বড়ো অবশ্যই । কিন্তু সারা দুনিয়া তাজমহল দেখে মুগ্ধ হয় । কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাজমহলের স্রষ্টা সম্রাট শাহজাহানকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন, 'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ' । আমরাও ঠিক ওই কথাই বলতে পারি ডাঃ ইব্রাহিমকে ।

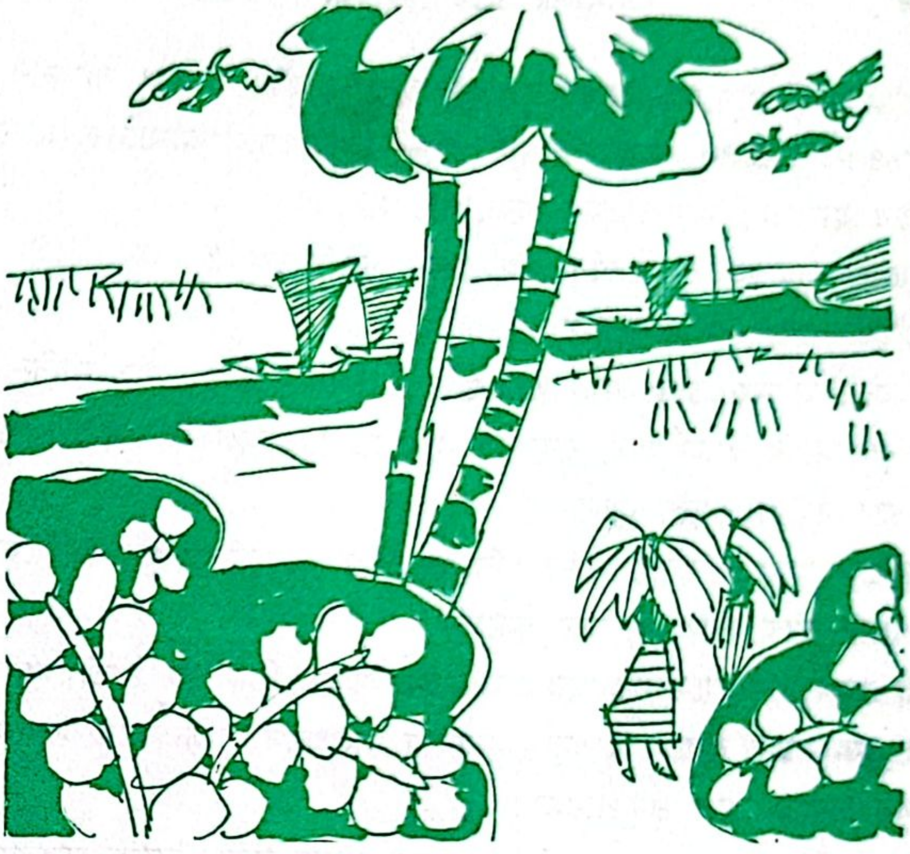
তিনি মারা গেছেন ১৯৮৯ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর । নিজের এক জটিল পুরোনো রোগের জন্যে নিয়মিত চেক-আপ সেরে লণ্ডন থেকে দেশে ফেরবার অল্পকাল পরই । দেশে ফিরে তিনি প্রথমেই যেতে চেয়েছিলেন তাঁর স্বপ্নের ফল 'বারডেম'-এ । কিন্তু তার আর সময় পাননি ।

তাঁর মৃত্যুতে সারা দেশের মানুষ চোখের পানি ফেলেছে । কিন্তু তার হাতে গড়া

'বারডেম' বন্ধ থাকেনি। যদিও থাকাটা উচিত ছিলো।

কিন্তু না, ভুল বললাম। উচিত ছিলো না। ডাঃ ইব্রাহিম বলে যান, তাঁর মৃত্যুতে যেন বারডেমে ছুটি দেওয়া না হয়। কেন ? না, ও হাসপাতাল বন্ধ থাকলে অসংখ্য রোগী কষ্ট পাবে, চিকিৎসা না পেয়ে ফিরে যাবে। এমন মানবদরদী কোটিতেও একজন মেলে কিনা সন্দেহ।





ভাবলে ভাবো খোলা হাওয়ায়

স্পেন দেশটা তখন আরবদের দখলে। তারা দেশটাকে বলে আন্দালুসিয়া। সেই আন্দালুসিয়ার দুটি জায়গার ভারী নাম। যেমন ধন-দৌলতের জন্যে, তেমনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার কারণে। জায়গা দুটির একটির নাম গ্রানাডা, অপরটির নাম কর্ডোভা।

শেষের ওই শহরটায়,—আজ থেকে প্রায় ন'শো বছর আগের কথা,—রাজত্ব করেন সুলতান আল-মনসুর। তাঁর এক দারুণ শখ, যেখানে যতো উঁচু দরের গুণী-জ্ঞানীর খবর পান, তাঁদের এনে তাঁর দরবারে জড়ো করেন। সাজিয়ে রাখেন যেন মনি-রত্নের মতো। ঠিক যেমন রাখতেন আমাদের উপ-মহাদেশে সম্রাট আকবর আর রাজা বিক্রমাদিত্য। তাঁদের দরবারের নব-রত্নের কথা এদেশে আজও রূপকথার মতো চালু রয়েছে। সুলতান আল-মনসুরের দরবারের সব জ্ঞানী-গুণী রত্নের নাম আমরা জানি না। কিন্তু কারো কারো কথা আজও লোকের মুখে মুখে ফেরে। তাঁদের একজনকে সুলতান আল-মনসুর দরবারে আনেন ঃ

সে রীতিমতো এক গল্প।

সুলতান মাঝে মাঝেই তাঁর দরবারে বলেন, আমরা বোধ হয় চেনাজানা সব গুণী-জ্ঞানীকেই দরবারে এনে সম্মান জানাতে পেরেছি।

তাঁর কথা শুনে আমীর-ওমরাহ্ জবাব দেন, হ্যাঁ, বাদশাহ্ নামদার। কিন্তু একদিন একজন বলেন, আমাদের শহরের— বলতে গেলে আমাদের ঘরেরই এক গুণী বোধ হয় বাদ রয়ে গেছেন, জাহাঁপনা।

সুলতান আগ্রহভরে শুধান, কে, কে— তিনি কে ?

তাঁকে নামটা জানানো হয়।

ঃ হ্যাঁ, আমিও তাঁর কথা শুনেছি বটে। কিন্তু তাঁর বয়স নাকি—

ঃ বয়সে কি এসে যায়, বাদশাহ নামদার ! আসল জিনিস তো গুণ।

ঃ তা বটে। ভুলটা আমারই।

সুলতান আর দেরি করেন না। বিশেষ প্রতিনিধি পাঠিয়ে, খুব তাজিমের সাথে সেই গুণীকে তাঁর দরবারে নিয়ে আসেন।

তা এমনভাবে যাঁকে দরবারে জায়গা দেওয়া হয়, তিনি কে ? তাঁর নাম আবুল ওয়ালেদ মোহাম্মদ ইবনে রুশ্‌দ্। আমরা সংক্ষেপে বলি আবু রুশ্‌দ্, আর ইউরোপের লোকে বলে এ্যাভারোস।

কিন্তু তাঁর কি এমন গুণ যে সুলতান তাঁকে নিজে ডেকে দরবারে ঠাঁই দিলেন ?

গুণ কি তাঁর এক দিকের ? তিনি দর্শনে পণ্ডিত, জ্যোতিষশাস্ত্রে পাকা, আইনে নামকরা আইনবিদ, ডাক্তারিতে ঝানু। সব বিষয়েই তাঁর প্রতিভা ছিলো অসাধারণ আর একেবারে অল্প বয়সেই দেশজোড়া নাম করে ফেলেছিলেন এসব শাস্ত্রে। পরে তো তাঁর সাথে টেক্কা দেওয়ার মতো লোক মেলাই ভার হয়ে পড়ে। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড়ো গুণ,—তিনি এতো বড়ো পণ্ডিত, অথচ তার জন্যে কোনো বড়াই ছিলো না তাঁর। কিংবা কোনো রকমের গোঁড়ামি। তিনি বলতেন, কোনো জিনিস নিয়ে যদি ভাবতে চাও, ভালো করে বুঝতে চাও, ভাববে খোলা হাওয়ায়, খোলা মনে। যে জিনিসটা যেমন, তাকে ঠিক তেমনিভাবে বুঝে নেয়াই হচ্ছে দার্শনিকের ধর্ম। আর একবার যদি ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারো, কখ্খনো তা নিয়ে কারো সাথে আপস করে মাথা নোয়াবে না।

আবু রুশ্‌দ্‌কে তাঁর এসব কথার জন্যে জীবনে অনেক ভুগতে হয়েছিলো। কিন্তু সেসব কথা পরে। আগে তাঁর সম্বন্ধে অন্য কিছু কথা বলে নিই।

তিনি আসলে ছিলেন দার্শনিক। তার পরে তাঁর সবচেয়ে বড়ো পরিচয় এর প্রায় উলটো একটা দিকে। সেই পরিচয়ে তিনি ডাক্তার। দার্শনিকরা হন আপনভোলা গোছের মানুষ। মাটির পৃথিবীর সাথে যেন তাঁদের যোগাযোগ থাকে না। কিন্তু ডাক্তারি করতে চাইলে মাটির পৃথিবীর সাথে চোখের সামনেকার বাস্তব

জিনিসের সাথে যোগাযোগ থাকতে হয় পুরো। আবু রুশদের তা-ই ছিলো।

অথচ ডাক্তারি করতেন তিনি দর্শনশাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা, চিন্তাভাবনা আর আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে। যেন অবসর কাটানো বা মন ভোলানোর জন্যে। একজন ইতিহাস-লেখক তাই বলেছেন, ডাক্তার আবু রুশ্‌দ্ সম্পূর্ণরূপে দার্শনিক আবু রুশ্‌দের আড়ালে পড়ে গেছেন। অথচ ডাক্তারিতে তাঁর যা কীর্তি, দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি কিছু না লিখলেও তা-ই তাঁকে অমর করে রাখতে পারতো।

চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে বই লিখেছিলেন অনেকগুলো। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নামকরা হল 'আল-কুল্লিয়াত ফি আৎ-তিব' বা চিকিৎসাশাস্ত্রের সাধারণ নিয়মাবলী। এই বইতে তাঁর সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। বইখানি আকারে বিরাট এবং সাত খণ্ডে বিভক্ত। তিনি এতে প্রমাণ করেন যে, একজন লোকের দু'বার বসন্ত রোগ হয় না। বইখানায় তিনি ধাত্রীবিদ্যার নানারকম বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা লিখে রেখে গেছেন। 'আল-কুল্লিয়াত ফি আৎ-তিব' প্রথমে ছাপা হয়ে বেরোয় ১৪৮২ সালে, ভেনিস শহর থেকে।

এবার আইনবিদ আবু রুশ্‌দের কথা।

ডাক্তার মানুষ আইন নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেন, শুনলে কেমন লাগে? আমি তো বলি, রীতিমতো আজব। আর লোকে বলে, মজার। কিন্তু কাণ্ড দেখো, ডাক্তারিতে আবু রুশ্‌দের যেমন নাম ছিলো দেশজোড়া, তেমনি আইনশাস্ত্রেও। আইনের ব্যাখ্যায় আর বিশ্লেষণে তাঁর এমন অদ্ভুত সূক্ষ্মবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যেতো যে, লোকে তার ওপর আর কথা বলবার সাহস পেতো না।

তাঁর এমনি আইনজ্ঞানের পুরস্কারও তিনি পেয়েছিলেন। এমন পুরস্কার, যা সহজে কোনো আইনবিদের ভাগ্যে জোটে না। তাঁকে এক সময় কর্ডোভা শহরের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি করা হয়।

এবার তাঁর দর্শনের কথা।

দার্শনিক আবু রুশ্‌দের পরিচয় দিতে গেলে তুমি এক কথায় বলতে পারো, তিনি হচ্ছেন দুনিয়ার সবচেয়ে বড়ো দার্শনিকদের একজন। আর তাঁর বৈশিষ্ট্য—তিনি ছিলেন অন্ধ বিশ্বাস, আন্দাজী জ্ঞান আর গোঁড়ামির পয়লা নম্বরের দুশমন।

আবু রুশ্‌দের যে সময়ে জন্ম হয়, আরবদের তখন পতনের যুগ শুরু হয়েছে। খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলের পর পাঁচশো বছর ছিলো তাদের দারুণ উন্নতির যুগ। সে এমন উন্নতি যে, তার কথা ভাবলেও অবাক হতে হয়। তাদের এই

উন্নতির মূলে ছিলো খোলা মনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা। এর জোরে তারা গড়ে তোলে এক নতুন সভ্যতা।

কিন্তু আবূ রুশ্‌দের আমলে সেই খোলা মনের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় ভাটা পড়ে আসে। মুসলমানদের জগত তার দরুন হয়ে উঠতে থাকে অন্ধকার। নানারকম গোঁড়ামিতে ভরে গিয়ে। তারা বলতে শুরু করে, আমরা যা জেনেছি, বুঝেছি, তার ওপরে আর কিছু হয় না।

আবূ রুশ্‌দ সবই শোনেন। তিনি নিজে ছিলেন খোলা মনের মানুষ। আর একেবারে ঠোঁটকাটা। যেটা সত্যি বলে বুঝতেন, সেটা স্বীকার করবার বেলায় কাউকে ডরাতেন না। আশপাশের লোকদের গোঁড়ামি-ভরা কথা শুনে তাই জোর গলায় প্রতিবাদ জানান, জ্ঞানের কোনো শেষ নেই। আর গোঁড়ামি দিয়ে সব কিছু জানা যায় না।

লোকে ক্ষেপে যায়, তার মানে ?

ঃ গোঁড়ামির অর্থ হল জ্ঞানচর্চার পথ বন্ধ করা। নতুন কিছু জানা তাতে আর সম্ভব হয় না।

ঃ বুঝেছি, তুমি এঁচড়ে পেকে গেছো। সুলতান তোমাকে অকালে দরবারে ঠাঁই দিয়েছিলেন। সে-ই হয়েছে তোমার কাল।

ঃ আর তোমাদের কাল হয়েছে ঠুলি পরা চোখ, কুলুপ-আঁটা মন।

গোঁড়া লোকেরা এরপর তাঁর বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগে। বিশেষ করে অল্পশিক্ষিত মোল্লা-মৌলবীরা। তারা তাঁকে গাল দিতে থাকে নাস্তিক বলে। এমনকি খৃস্টানদের কাছেও তাঁর কথাবার্তা হয়ে ওঠে শয়তানের বাণীর মতোই বিভীষিকা-রূপ। দু'দলই মুক্ত বুদ্ধি— মানে খোলা মনের নাম দিলো ধর্মহীনতা।

শেষটায় ব্যাপার এমন দাঁড়ায় যে, তাঁর সমস্ত লেখার মনগড়া মানে করা হতে থাকে। দর্শনে আবূ রুশ্‌দের গুরু ছিলেন গ্রীসের বিখ্যাত দার্শনিক এ্যারিস্টটল। যাঁকে আজও সারা দুনিয়ার লোকে মহাপণ্ডিত বলে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু আবূ রুশ্‌দের উপর আক্রোশের দরুন তাঁর দুশমনরা বলতে থাকে, এ্যারিস্টটলের নাম মুখে আনলেও গোনাহ্‌ হয়।

দুশমনরা অবশ্যি তাঁকে শুধু গালাগালি দিয়েই ক্ষান্ত থাকে না। তারা সুলতান আল-মনসুরের দরবারে গিয়েও হল্লা শুরু করে, জাহাঁপনা, এর একটা বিহিত করুন।

ঃ কিসের কি বিহিত করবো, বলুন।

ঃ দর্শন-টর্শনের চর্চা চলবে না।

ঃ কেন, কেন ?

ঃ দর্শন মানে হচ্ছে অবিশ্বাস, দর্শন মানে অসাধুতা আর দুর্নীতি । আপনি কি এসব চান ?

সুলতান আমতা আমতা করেন, তা অবশ্যি চাইনে । তবে কিনা—

ঃ এর মধ্যে কোনো 'তবে কিনা' নেই । দেশকে, সমাজকে, আমাদের এতো দিনের জ্ঞান-বিজ্ঞান-সভ্যতাকে বাঁচাতে হলে দর্শনের চর্চা বন্ধ করতেই হবে ।

সুলতান এবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর শুধান, তা কিভাবে ?

ঃ আবূ রুশ্‌দকে আপনার দরবারে রাখা চলবে না। শুধু দরবার কেন, কর্ডোভা শহরেই তাঁকে যেন আমরা আর না দেখি।

সুলতান আর কি করেন ? তাদের চাপে পড়ে আবূ রুশ্‌দকে বলেন, আপনাকে আর কর্ডোভায় রাখতে পারবো না । তবে আপনি যদি মাফ চান, আপনার মতটত পালটান, তাহলে অন্য কথা । আমি সবাইকে বুঝিয়ে বলবো ।

আবূ রুশ্‌দ্ পষ্ট গলায় জবাব দেন, তার আর দরকার নেই জাহাঁপনা । আমি এখান থেকে চলেই যাবো ।

তোমরা বোধ হয় এই উপমহাদেশের এক বিখ্যাত মানবতাবাদী নেতা এম. এন. রায়ের (মানবেন্দ্রনাথ রায়ের) নাম শুনেছো। তিনি তাঁর বই 'ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা'য় আবূ রুশ্‌দের ওই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করেন । তিনি লিখেছেন, কর্ডোভা শহর ছিলো বহু শতাব্দীর স্বাধীন চিন্তার আশ্রয় । সেখান থেকে আবূ রুশ্‌দ্‌কে তাড়িয়ে দিয়ে মুসলমানরা যেন নিজেদেরই অস্বীকার করে ।

তবে নিজের জাতের লোকদের হাতে তাঁর এই যে অপমান, এতে তাঁর ক্ষতি হয়েছিলো মাত্র কিছুকালের জন্যে । পরে এরই জন্যে দুনিয়ায় তাঁর খ্যাতি-সম্মান আরো বেড়ে যায় । তাঁর আমলে ইউরোপের খৃস্টান সমাজে এক ভয়ানক বিরোধ বাধে বিশ্বাসের সাথে যুক্তির, গোঁড়ামি আর অন্ধ বিশ্বাসের সাথে খোলা মনের, চিন্তার । এর মূলে অনেকখানি কাজ করে আবূ রুশ্‌দের কথাবার্তা আর মতবাদ । জ্ঞান আর সভ্যতা বিস্তারের সাথে সাথে লোকে তাঁর যুক্তি বুঝতে শুরু করে । তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় চারশো বছর ইউরোপে বৈজ্ঞানিক চিন্তার জগতে তাঁর মতবাদের সাথে পাল্লা দেওয়ার মতো কিছু ছিলো না । এমনকি, আধুনিক যুগের আগ অবধি তাঁর দর্শনের সারকথা হয়ে থাকে আবূ রুশ্‌দের মতবাদ ।

এদিকে কর্ডোভার লোকে তাদের ভুল বুঝতে পারে অল্পকাল পরই। আবু রুশ্‌দ্‌কে তাই খুব বেশিদিন বাইরে পড়ে থাকতে হয়নি। সুলতান আবার তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। শুধু আগের মতো সব ব্যাপারে স্বাধীনতা তিনি আর পাননি। তবে তাঁর মূল রচনাগুলো ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে যায়। ল্যাটিন অনুবাদে সেগুলোর নানারকম পরিবর্তন করা হয়েছিলো। অনুবাদকদের পছন্দ নয়, এমন কিছুই তাঁরা অনুবাদে রাখেননি। এবার সব ঝামেলা মিটলো।

আবু রুশ্‌দ্‌ জন্মেছিলেন কর্ডোভাতেই, ১১২৬ খৃস্টাব্দে। আর তাঁর মৃত্যু হয় ১১৯৮ খৃস্টাব্দে, বাহাত্তর বছর বয়সে। সেও ওই কর্ডোভা শহরেই।





গান-বিজ্ঞান সমান কথা

গান যদি যায় ডাইনে, তো বিজ্ঞান যায় বামে,—লোকে বলে এমনি কথা। এখন তো বটেই, দু'চারশো বছর আগেও শোনা গেছে এই-ই। কিন্তু প্রায় বারোশো বছর আগের এক ভদ্রলোক, যাঁর আমলে না ছিলো আজকালকার মতো বিজ্ঞানের এতো চর্চা, না গান-বাজনার—তিনি বলে বসলেন, না, তা কেন হবে।

লোকে তাঁর কথা বুঝতে পারে না। অবাক হয়ে শুধায়, তার মানে ?

ঃ অতি সোজা। গান-বিজ্ঞান একই পথে চলে।

লোকে আবার অবাক, তা কেমন করে হয় ? গান শোনার জিনিস। আর বিজ্ঞান দেখবার। তাহলে—

ঃ তাহলে তারা এক পথে কেমন করে চলে,—এই তো ?—ভদ্রলোক হাসেন,মানে, আপনারা বলতে চান, যাদের ভেতর কোনো মিল নেই, তারা আলাদা আলাদা পথে চলবে, এই-ই তো স্বাভাবিক। তা ঠিক। কিন্তু আমি যদি বলি, একটি শোনার, একটি দেখার হলেও দুটির মধ্যে খুব মিল আছে, তাহলে ?

লোকে আমতা আমতা করে। তার কারণ কি ? না, তিনি না জেনে কোনো কথা বলেন না। তারা তাই শেষে জিজ্ঞেস করে, তা দুটিতে মিলটা কি ?

ঃ নিয়মের। গানে তাল আছে, মাত্রা আছে। সবই হিসাবের ব্যাপার। আর হিসেব মানে অঙ্ক— আসলে যা বিজ্ঞান।

লোকে এবার চুপ।

গানের সাথে বিজ্ঞানের এই সম্পর্কের গল্পটি অবশ্যি বানানো। তবে গল্পের নায়ক ভদ্রলোককে নিয়ে এমন গল্প অনায়াসেই সত্যি হতে পারতো। তার কারণ, গান-বাজনার চর্চা যাঁরা করেন, তাঁরা ছাড়া আর প্রায় সবারই ধারণা, এ সবের সাথে অঙ্ক বা বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই। অন্যদিকে, গল্পের নায়ক দেশ-বিদেশের গান-বাজনা নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা করেন। তার ওপর তিনি নিজে ছিলেন একজন নামকরা বিজ্ঞানীও। অবশ্যি, তখনকার দিনের মানুষ তাঁকে তার চেয়েও বেশি করে জানছে দার্শনিক হিসেবে।

কিন্তু এসব কথা বিস্তারিতভাবে আমরা জানবো একটু পরে। এখন জেনে নেই তাঁর নামটি এবং সাধারণ কিছু পরিচয়।

ভদ্রলোকের নাম ছিল আল-কিন্দি। বুঝতেই পারছো, এটা সংক্ষিপ্ত নাম। তাঁর পুরো নাম ছিলো বেশ লম্বা, আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইসহাক আল-কিন্দি। ইউরোপে তিনি পরিচিত আল-কিন্দাস নামে।

তাঁর জন্ম তারিখ নিয়ে একটু মতভেদ আছে। তবে জানা যায়, তাঁর জন্ম হয় ৮১০ থেকে ৮১৫ খৃস্টাব্দের মধ্যে। জন্মস্থান আরবের কূফা শহর। এবার দেখা যাক, তিনি গান-বিজ্ঞান এক সাথে মেলালেন কেমন করে।

তোমাদের মধ্যে যাদের গানের গলা আছে, তারা কোথাও একখানা গান শুনলে চট করে তা শিখে নিতে পারো। আবার না শুনেও গান শেখার ব্যবস্থা আছে। সেটা হচ্ছে স্বরলিপির সাহায্যে শেখা। গান যতো দিনের পুরোনোই হোক এবং যতো দূরেরই হোক না কেন, তাতে কিছুই এসে যায় না। তার স্বরলিপিটা যদি তোমাদের সামনে থাকে, তোমরা এক মুহূর্তেই বলে দিতে পারবে তার হাঁড়ির খবর, নাড়ীর খবর। গানটি কোন্ রাগের, তার তালই বা কি ইত্যাদি। স্বরলিপি তাই গানের প্রচার অনেক সহজ করে দিয়েছে।

এখন গান তো মানুষের সমাজে সেই আদ্যি কাল থেকেই আছে। কিন্তু বলতে পারো, স্বরলিপির সাহায্যে গানের প্রচার কবে থেকে শুরু হয়ে ছিলো?

বিষয়টি নিয়ে অবশ্যি নানা মুনির নানা মত। কিন্তু বেশির ভাগ পণ্ডিতেরই কথা, বৈজ্ঞানিক উপায়ে, মানে, তাল-মাত্রা-চিহ্নের সঠিক হিসেব দিয়ে— স্বরলিপির প্রচার শুরু করেন ওই আরব সঙ্গীতবিদ আল-কিন্দি। আরব এবং গ্রীসের সঙ্গীত তত্ত্ব নিয়ে তিনি বহুদিন গবেষণা চালান। ইউরোপের সভ্য সমাজে তাঁর ধরনের গবেষণা আর স্বরলিপি প্রচার শুরু হয় অনেক পরে।

আল-কিন্দির লেখা যেসব বইপত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে, সে গুলির তালিকা রীতিমতো লম্বা। আর তাতে দেখা যায়, তিনি সঙ্গীত নিয়ে বই লিখেছিলেন অন্তত সাতখানা। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে নামকরা 'রিসালা ফি খুবর তা'লিক

আল-এলহান'। এতে তিনি পুরোনো কালের গ্রীস আর আরবের সঙ্গীত তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন।

বইখানায় যে পদ্ধতির স্বরলিপি পাওয়া যায়, সব পণ্ডিতেরই মত, তার থেকে ভালো পদ্ধতি সে যুগে আর কোনো দেশে চালু ছিলো না। আর একালের স্বরলিপি-পদ্ধতিও তারচেয়ে খুব বেশি উন্নতি করতে পারেনি।

সঙ্গীত নিয়ে লেখা আল-কিন্দির বাকি ছয়খানা বইও ফেলনা ছিলো না। এগুলিতে তিনি সঙ্গীতের তাল-লয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সেই সঙ্গে তাদের সাথে জড়িত আরো কিছু বিষয়েরও।

আজ থেকে প্রায় বারোশো বছর আগে সঙ্গীতের মতো কঠিন বিষয় নিয়ে সাত-সাতখানা বই লেখা ! এ যে রীতিমতো তাক লাগানো ব্যাপার।

কিন্তু আল-কিন্দি যে এর থেকেও বড়ো তাক লাগানো কাণ্ড করেছিলেন, তা তো তোমাদের আগেই বলেছি। অবশ্যি সংক্ষেপে। এবার এসো, সেগুলোর একটু বিস্তারিত খবর নিই।

প্রথমে বিজ্ঞানের কথা।

এটার খবর নিতে গেলে চোখ আমাদের একদম কপালে উঠে যায়। বিজ্ঞানের দুনিয়ায় তিনি যেন ঘুরে বেড়াতেন ডালে ডালে পাতায় পাতায়। নইলে কি আর শুধু বায়ু নিয়েই লেখেন এক গাদা বই ? হ্যাঁ, নানান সূত্রে খবর মেলে, তিনি বায়ুবিদ্যা নিয়ে বই লিখেছিলেন কম করে হলেও পনেরো খানা। সেসব বইয়ে তিনি বিদ্যাটার নানান প্রশ্নের জবাব দেন।

ওজন, জোয়ার-ভাটা আর আলোকবিজ্ঞান নিয়েও তিনি ব্যাপকভাবে গবেষণা চালান। শোনা যায়, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বলে একটা কিছু থাকতে পারে, এমন কথাও তিনি ভাবতেন। সেই তখন, নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের প্রায় আটশো বছর আগে! আলোকবিজ্ঞান নিয়ে আল-কিন্দির একখানা বই ইউরোপের স্কুল-কলেজে অনেক দিন পাঠ্য ছিলো।

গণিতবিদ হিসেবেও আল-কিন্দির নামডাক কিছু কম নয়। তাঁর বিশ্বাস ছিলো, গণিতই হচ্ছে সব বিজ্ঞানের বুনিয়াদ। জ্যামিতির দুই-একটি বিষয়কে তিনি রসায়ন আর চিকিৎসার ক্ষেত্রেও কাজে লাগানোর চেষ্টা করেন।

তা চিকিৎসার কথাই যখন উঠলো, তখন আর একটি তাক লাগানো খবর দিই।

মানুষটি গান নিয়ে মাথা ঘামান, বিজ্ঞান নিয়ে ভেবে মরেন। কিন্তু তাতেই কি দুনিয়ার সব ভাবনা চুকে যায় ? পেট বলে একটা খোঁদল আছে। তাকে রোজ খাবার দিয়ে ভরতে হয়। পিঠ বলে একটা জায়গা আছে। তাকে কাপড় দিয়ে ঢাকতে হয়। মাথা বলে একটা জায়গা আছে। তার ওপর একটা ছাদ চাই। আর

এগুলির প্রত্যেকটির জন্যে দরকার টাকা । যা গতর কিংবা মাথা না খাটালে মেলে না । সারাক্ষণ গান-বিজ্ঞান নিয়ে থাকলে সেই খাটানোর সময়ই বা জোটে কোথায় ? আল-কিন্দিকে তাই আর এক ধান্ধায় ঘুরতে হয় । যার নাম চাকরি ।

কিন্তু প্রতিভা তাঁর পঞ্চমুখী । চাকরির জন্যে তাই ভাবতে হয় । জীবনে শিখেছেন অনেক বিষয়ে । সে সবের মধ্যে একটি হল ডাক্তারি । তাও আবার যেমন-তেমন করে শেখা নয় । এমনভাবে যে, তাঁর ডাক্তারির কাজ জুটে যায় একেবারে রাজ দরবারে । খাস বাগদাদ শহরে । প্রথমে খলীফা আল-মামুনের আমলে । তারপর তিনি গত হলে, খলীফা আল-মু'তাসিমের সময় ।

তা—কেমন ডাক্তারি শিখেছিলেন তিনি, যার জোরে একেবারে খলীফার দরবারে ডাক্তার হয়ে যান ? তাঁর খবর যাঁরা রাখেন, তাঁরা বলেন, বিজ্ঞানে তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান চিকিৎসাবিদ্যায় । এ পর্যন্ত তাঁর প্রায় বিশখানা চিকিৎসা বিদ্যার বইয়ের নাম পাওয়া গেছে । জেরাড নামে এক মনীষী সেগুলির একখানা ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন । এই বইখানা ওষুধ তৈরির পদ্ধতি, রোগ বালাইয়ে ওষুধ ব্যবহারের মাত্রা ইত্যাদি নিয়ে লেখা ।

তবে কিনা—ডাক্তারিতে তিনি যতোই পাকা হন, তাঁর নামডাক সবচেয়ে বেশি ছিলো দার্শনিক হিসেবে । দর্শন নিয়েও তিনি অনেকগুলো বই লেখেন । এগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হল 'প্রজ্ঞা', 'দ্বৈতবাদীদের মতবাদ খণ্ডন', 'কুতর্কীদের মতবাদ মণ্ডন' ইত্যাদি । দর্শনে তিনি ছিলেন পুরোনো কালের গ্রীসের বিখ্যাত পণ্ডিত এ্যারিস্টটলের মতবাদের অনুসারী । তাঁর বইগুলোয় গ্রীক, মুসলিম এবং ওই সময়কার অন্যান্য দর্শনের বহু বিষয়ের আলোচনা করা হয় ।

আল-কিন্দি অল্প বয়সেই খলীফার দরবার এবং দেশ-বিদেশের গুণী সমাজে দারুণ সম্মান পেয়েছিলেন । ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদির কঠিন কঠিন বিষয় এবং সমস্যা সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রায় সবাই শ্রদ্ধার সাথে মেনে নিতেন ।

আল-কিন্দি কতো বই লিখেছিলেন, তার একটা আভাস তোমরা নিশ্চয়ই উপরের আলোচনা থেকে পেয়েছো । তাঁর সব বই-ই ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়েছিলো । তিনি বায়ুবিদ্যার যে সমস্ত বই লিখেছেন, সে গুলির একখানার অনুবাদ করেন হিউগো স্যাংটিলেনসিন নামে এক পণ্ডিত । জেরাড তাঁর চিকিৎসাশাস্ত্রের যে বইখানার অনুবাদক, ১৯৩১ সালে সেখানি জার্মানির স্ট্রাসবুর্গ শহর থেকে ছাপা হয়ে বেরোয় । আলোকবিজ্ঞান সম্পর্কে আল-কিন্দির মতবাদগুলি অনুবাদের মাধ্যমে বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক-বিজ্ঞানী রোজার বেকনের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে ।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখন তাঁর বেশির ভাগ বইয়েরই কোনো সন্দান পাওয়া যায় না । আশা করি, তোমরা বড়ো হয়ে সেগুলোর খোঁজ-খবর নেবে ।



কলেজ ছেড়ে দেশের লড়াই

না, নামটা তোমাদের জানা থাকার কথা নয় । যাঁরা ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, আমাদের অতীতের কিছু খোঁজ-খবর রাখেন, তাঁদেরও অনেকেই এই নামটি জানেন না । অথচ একদিন ছিলো, যখন আমাদের উপমহাদেশে এ নাম প্রায় সবার মুখে মুখে ফিরতো । সেটা খুব বেশি দিনের কথাও নয় । গত শতাব্দীর শেষ দিকে আর এই শতাব্দীর প্রথম দিকের ব্যাপার ।

তা—তাঁর এতো নামডাকের কারণ কি ?

কারণ হল, তিনি ছিলেন উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক দুঃসাহসী নেতা । তাও আবার এমন এক সময়ে, যখন স্বাধীনতার কথা মুখে আনাকেও সরকার বলেছে গুরুতর অপরাধ । তখন এই উপমহাদেশ ইংরেজদের অধীন এক সাম্রাজ্য । এখানকার ধন-সম্পদ লুঠ করে তাদের দেশ ফুলেফেঁপে উঠছে । এমন সোনার-ডিম-দেওয়া হাঁসকে কি কেউ সহজে হাত থেকে ফসকে যেতে দেয় ? তারা তাই এখানকার শাসন চালাতো কড়া হাতে । কোথাও স্বাধীনতা আন্দোলনের গন্ধটুকু পেলেও তা সহ্য করেনি । তাকে গোড়াতেই পিষে ফেলবার জন্যে সব রকমের হাল-হাতিয়ার নিয়ে ছুটে যেতো । এমন অবস্থায় স্বাধীনতার জন্যে আন্দোলন করা যে কেমন কঠিন আর ঝুঁকির ব্যাপার ছিলো, তা তোমরা সহজেই বুঝতে পারো ।

এখানে দেশকে যারা ভালোবাসতেন, তাঁরা অবশ্যি ঝুঁকিটুকি দেখে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকেননি । যখন যেখানে যেভাবে পেরেছিলেন, সেভাবেই বিপদ মাথায় নিয়ে স্বাধীনতার জন্যে আন্দোলন চালিয়ে গেছেন । কখনো সমাজ সংস্কারের নামে বাঁকা পথে পরোক্ষভাবে, কখনো বা গোপনে—সরাসরি । দলে তাঁরা খুব ভারী ছিলেন না । তাঁদের তাই চলতে হত বড়োই অসুবিধার মধ্যে ।

আমি তোমাদের যে মানুষটির গল্প শোনাতে বসেছি, তিনি কিন্তু কোনো কিছুরই পরোয়া করেননি । তিনি নিজেকে স্বধীনতা আন্দোলনের পথে জড়িয়ে .ফেলেন একেবারে ছোট বেলায়ই । বলতে গেলে, যখন তাঁর বয়স মোটে ছয় বছর—তখন থেকেই । ঝুঁকিটুকির কথা জেনেও । আর তারপর জীবনের শেষদিনতক স্বাধীনতার জন্যে নানাভাবে কাজ করেছেন ।

কিন্তু—এই মানুষটি কে ? শেখ-উল-হিন্দ মাহ্‌মুদুল হাসান ।

স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকে তাঁর ঝুঁকে পড়বার মূলে ছিলো দুটি বিষয় । এক. ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ । ইংরেজরা আসল ব্যাপার চেপে রাখবার মতলবে যার নাম দিয়েছিলো সিপাহী বিদ্রোহ । আর আমরা যাকে বলি উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ । দু'নম্বর জিনিসটি তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । মানে কিনা—যেখানে তিনি লেখাপড়া শেখেন । সেটি তখন উপমহাদেশে মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষার সবচেয়ে বড়ো আর নামকরা প্রতিষ্ঠান,—দেওবন্দ মাদ্রাসা । যার মর্যাদা কলেজের মতো ।

তা—এগুলো তাঁকে কিভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে টানলো ?
সেকথা পরে বলি । আগে তাঁর জীবনের অন্য কিছু কথা শুনে নাও ।

মাহ্‌মুদুল হাসানের জন্ম হয় ১৮৫১ সালে । এখনকার ভারতের উত্তর প্রদেশ রাজ্যের বেরিলিতে । পরে তিনি চলে যান মীরাটে । সেই মীরাট, যেখানে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ প্রথম ব্যাপকভাবে শুরু হয় । শহরটির সেনানিবাসে বিদ্রোহের নেতা ছিলেন সুবেদার বখত খান । পরে যিনি হন মহাবিদ্রোহের প্রথম প্রধান সেনাপতি । মীরাটের বিদ্রোহের পর তিনি তাঁর সৈন্যসামন্ত আর গোলা-বারুদ নিয়ে চলে যান দিল্লীতে । তার পর বিদ্রোহ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে ।

মাহ্‌মুদুল হাসানের বাবা ছিলেন বিদ্রোহের দলে । অবশ্যি মনে মনে । তাঁর কাছে মাহ্‌মুদুল হাসান মাঝে মাঝে বিদ্রোহের নানারকম গল্প শোনেন । বিদ্রোহীরা কোথায় যুদ্ধে ইংরেজদের হারিয়ে দিয়েছে, কোন্ বিদ্রোহী কেমন বীরের মতো লড়েছেন,—এই সব ।

শুনতে শুনতে মাহ্‌মুদুল হাসানের বুকের মধ্যে কেমন জানি করে ওঠে । রক্তে যেন এক নাচন লাগে। সেই সঙ্গে মাথাটা হয়ে ওঠে গরম । বিশেষ করে, যখন তিনি শোনেন, হেরে-যাওয়া বিদ্রোহীদের ধরে ইংরেজরা কামানের মুখে বেঁধে উড়িয়ে দেয় । যাঁরা বিদ্রোহের পক্ষে বলে সন্দেহের পাত্র, তাঁদের গ্রামকে গ্রাম আগুন লাগিয়ে ছাই করে ফেলে । তখন মাহ্‌মুদুল হাসান বার বার শিউরে ওঠেন । তাঁর মনটা যেন চিৎকার করে বলতে চায়, এমন কেন হবে ?

মোটে ছয় বছর যার বয়স, তার তো খেলাধুলায় দিন কাটবার কথা । খেলাধুলা যে মাহ্‌মুদুল হাসান করেন না, তাও নয় । কিন্তু তার মধ্যেও তাঁর মনের ভেতর ঘুরতে থাকে বিদ্রোহীদের কথা । বিদ্রোহ, স্বাধীনতা, এসব কথার আসল মানে বুঝবার বয়স তখন তাঁর হয়নি । তবু নিজের অজানতেই তিনি মনে মনে ভিড়ে যান বিদ্রোহীদের দলে ।

এরই মধ্যে শুরু হয় তাঁর লেখাপড়া । প্রথমে বাড়িতে, তারপর মাদ্রাসায় । সবই প্রাথমিক লেখাপড়া । তাতে তাঁর কাটে প্রায় দশ বছর ।

তারপর,—তাঁর বয়স যখন পনেরো, তখন তাঁকে আরো পড়াশোনার জন্যে পাঠানো হয় দেওবন্দের মাদ্রাসায় । দেওবন্দ জায়গাটিও উত্তর প্রদেশেই, তার শাহারানপুর জেলায় । সেখানকার মাদ্রাসাটি চালু হয়েছে সেই বছরই । কাজেই কোনো নামডাক তার থাকার কথা নয় । তবু তখনই তার ছিলো এক বিশেষ আকর্ষণ। এ মাদ্রাসা যাঁরা স্থাপন করেন, তাঁরা সবাই তখনকার দিনের অতি নামযাদা জ্ঞানীগুণী । তার ওপর সমাজকে ঢেলে সাজিয়ে নতুন রূপ দেওয়ার পক্ষপাতী । হ্যাঁ, তাঁরা চেয়েছিলেন মুসলমান সমাজকে খাঁটি ধর্মীয় শিক্ষা দিয়ে নতুন রূপে গড়ে তুলতে । আর তার চেয়েও বড়ো কথা, মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠার একটি উদ্দেশ্য স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামে নামবার উপযোগী শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা । মাহ্‌মুদুল হাসানের বাবা কেমন মানুষ ছিলেন, তা তো একটু আগেই শুনেছো । তিনি ছেলেকে এই নতুন মাদ্রাসাতে ঢুকিয়ে দেন অনেক ভেবে-চিন্তে, পুরোনো নামীদামী মাদ্রাসা ছেড়ে ।

এখন মাহ্‌মুদুল হাসান দেওবন্দেই আছেন ।

থাকতে থাকতে— একে একে আটটি বছর কেটে যায় ।

এই আট বছরে তিনি ইসলাম ধর্মের নানান বিষয়ে পণ্ডিত হয়ে ওঠেন । তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে দেওবন্দের সবার মধ্যে ।

এদিকে, তখন দেওবন্দের শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন দুজন ডাকসাইটে পণ্ডিত, রশীদ আহমদ জানাগাহী আর মোহাম্মদ কাশেম নানাউৎভী । কিন্তু তাঁরা শুধু

পণ্ডিতই নন, তলে তলে স্বাধীনতা সংগ্রামীও । সুতরাং তাঁদের সোহবতে মাহ্মুদুল হাসানের কি গতি হল, বুঝতেই পারছো । মহাবিদ্রোহের গল্প শুনে শুনে মন তো তাঁর আগে থেকেই চাষ-দেওয়া জমিনের মতো তৈরি । এবার সেখানে সরাসরি পড়ে স্বাধীনতার বাণীর বীজ । মাহমুদুল হাসান হয়ে ওঠেন স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্যেও তৈরি ।

কিন্তু ঠিক তখনই তিনি সংগ্রামে নামলেন না । আর কিছু নয়, কেবল ভালো একটা সুযোগের অভাবে । সেই সুযোগ যতো দিন না আসে, ততো দিন তিনি হয়ে থাকবেন মানুষ গড়ার কারিগর, ছাত্রদের ভেতর থেকে নতুন নতুন স্বাধীনতা সংগ্রামী তৈরি করবেন ।

তাতে কোনো অসুবিধাও ঘটে না । পড়াশোনা শেষ হলে তিনি চাকরি পান ওই দেওবন্দ মাদ্রাসাতেই । আর তারপর সেই চাকরিতে এমনি কামিয়াবি যে, বারো বছরের মধ্যেই উঠে যান একেবারে ওপরের ধাপে। মানে কিনা— তিনি হন একদম প্রিন্সিপ্যাল ।

মাহমুদুল হাসান এই সময়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্যে মানুষ গড়েন ঠিকই । তাই বলে আর কিছুই যে করেন না, তা কিন্তু নয় । সারা উপমহাদেশে তখন স্বাধীনতা সংগ্রামের আয়োজন চলছে । বেশিরভাগই গোপনে । আর যাঁরা এই আয়োজন করছেন, তাঁদের অনেক দল, অনেক ঘাঁটি । মাহ্মুদুল হাসান সেসব দল আর ঘাঁটির খোঁজখবর নেন । আর মওকা পেলেই তাদের সাথে যোগাযোগ করেন । অবশ্যি সবই গোপনে ।

একটা ঘাঁটি ছিলো ইয়াগিস্তান নামে একটি জায়গায়, তখনকার ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকায় । জায়গাটা দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চল । সেখান থেকে আগে একবার ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয়েছিলো । দেওবন্দের দলের স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরও তাই চোখ পড়ে জায়গাটির দিকে ।

তারপর একদিন কি হয় ? না, মাহ্মুদুল হাসান তাঁর দলবল নিয়ে টুক করে সরে পড়েন ইয়াগিস্তানের দিকে । সেখানে বানিয়ে ফেলেন নিজেদের একটা ঘাঁটি । উদ্দেশ্য, সেই ঘাঁটি থেকে তাঁরা একটা ফৌজ গড়ে তুলবেন । ইয়াগিস্তানের বাসিন্দারা মুসলমান । আর ভারী দুর্ধর্ষ । খুব ভালো সৈন্য হওয়ার মতো । তারা তো সেনাবাহিনীতে থাকবেই, তার ওপর দরকার মতো নেয়া হবে উপমহাদেশের অন্য সব এলাকার লোকও ।

না, দরকার মতো কেন, নীতিমাফিকই । ভারত তো তখন মস্তবড় দেশ। সেখানে বাস করে নানান জাতের নানান মতের মানুষ । তাদের ভেতরও সৈন্য

হওয়ার মতো লোক আছে অনেক । তাই তাদের বাদ দেওয়া কি উচিত ? নাকি শুধু এক অঞ্চল, এক জাতের মানুষ নিয়ে ইংরেজের মতন দুশমনের সাথে লড়াই করা সম্ভব ?

মাহমুদুল হাসান তাই ভাবলেন, তাঁদের ফৌজে লোক নিতে হবে সব জাতের, সব এলাকার । আর সেই সঙ্গে চাই আর একটা কাজ । তাঁদের ঘাঁটি গড়ে তুলতে হবে আরো কিছু জায়গায় ।

সেই ঘাঁটি গড়বার আগেই ইয়াগিস্তানে গড়া হল এক ফৌজ । মানে, সেনাবাহিনী । হাজী তুরঙ্গজায়ী নামে এক ইয়াগিস্তানীকে সেনাপতি করে । তারপর চলে উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের ভেতর থেকে সৈন্য সংগ্রহের কাজ । আর গোপনে যোগাযোগ হয় আফগানিস্তানের আমীর হাবীবুল্লাহ্‌র সাথে। তাঁকে দলে টানবার জন্যে । দরকারের সময় তাঁর সাহায্য পাওয়ার আশায় । আর দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের সাথে যোগাযোগ তো আছেই ।

সৈন্য জোটে বেশ কিছু । সেই সঙ্গে কর্মীও । কর্মীদের নিয়ে রাখা হয় দেওবন্দে । ওবায়েদুল্লাহ্ সিন্ধী নামে এক ভদ্রলোক— মাহ্‌মুদুল হাসানের এক কালের ছাত্র, তখন পাঞ্জাবে দলের কাজকর্ম করেন । মাহ্‌মুদুল হাসান তাঁকে হুকুম দেন, তুমি দেওবন্দ চলে যাও, লড়াইয়ের উদ্যোগে লেগে পড়ো ।

হুকুম পেয়ে সিন্ধী দেওবন্দে গিয়ে গড়ে তোলেন একটা সমিতি । তার কাজ হবে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাহায্য করা । তারপর তিনি যান দিল্লী । সেখানেও গড়েন— না, ঠিক সমিতি নয়, একটা মাদ্রাসা । কিন্তু আসলে সেটা দেওবন্দের সমিতির দোসর । মানে, তারও লক্ষ্য থাকে লড়াইয়ের ব্যাপারে সাহায্য করা ।

ইতিমধ্যে মাহ্‌মুদুল হাসান হয়েছেন 'শেখ-উল-হিন্দ', ভারতের শেখ অর্থাৎ বাদশাহ্ । তাঁর যাঁরা ভক্ত, তাঁদের দেওয়া খেতাবে । তখন থেকে লোকে তাঁকে ওই নামেই চেনে । .

তা তো হল । কিন্তু লড়াইয়ের খবর কি ?

এবার সেই কথা বলি ।

লড়াইয়ের যোগাড়-যন্তরে কেটে গেছে অনেক বছর । এখন দরকার লড়াইয়ের ময়দানে নেমে পড়া । একটা বিপ্লব বা বিদ্রোহ ঘটিয়ে, তারপর লড়াইয়ে ইংরেজ সরকারকে কাত করে ফেলা ।

তার একটা মওকাও আসে।

১৯০৫ সালে তখনকার বাংলাদেশকে ভেঙে দু'টুকরো করা হয়েছিলো । ইংরেজদের একবিশেষ প্রয়োজনে । মুসলমানদের খুশি করতে । কিন্তু ১৯১১ সালে

দুই টুকরো আবার জোড়া লাগানো হয় । ওদিকে ইউরোপে তখন চলছে মুসলিম দেশ তুরস্কের বিরুদ্ধে দারুণ যুদ্ধ । তাতে তুরস্কের বড় শত্তুর ইংরেজ । এসবের দরুন মুসলমানরা ইংরেজের ওপর ক্ষ্যাপা । উপমহাদেশের অন্য লোকেরা তো আগে থেকেই ক্ষেপে রয়েছে ।

মাহ্‌মুদুল হাসান সুযোগটা কাজে লাগালেন । ক্ষ্যাপা কিছু লোক দলে টেনে । আর তৈরি করে ফেলেন এক পরিকল্পনা । ইংরেজের বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াইয়ের ময়দানে নেমে পড়বার জন্যে ।

এর বছর কয়েক পরই বাধে প্রথম মহাযুদ্ধ । তারও একদিকে বড়ো শরিক ইংরেজ । অন্যদিকে জার্মানরা । মাহ্‌মুদুল হাসান এবার চাইলেন জার্মানিকে নিয়ে জোট বাঁধতে । সেই সঙ্গে আফগানিস্তানকে দলে টেনে ।

জার্মানি তাদের সাহায্য করতে একপায়ে খাড়া । তারা আফগানিস্তানে প্রতিনিধি পাঠায় । মাহ্‌মুদুল হাসানের দলের সাথে যোগাযোগ করতে । কিন্তু আফগানিস্তানের আমীর লোকটি বিশ্বাসঘাতক । তিনি করেন কি ? না, সাহায্য দেওয়া তো দূরের কথা, মাহ্‌মুদুল হাসানের পরিকল্পনাটা ইংরেজদের জানিয়ে দেন ।

ইংরেজরা কি এমন সুযোগ ছাড়ে ? তারা হন্যে হয়ে ঘুরতে থাকে মাহ্‌মুদুল হাসান আর তাঁর দলের লোকদের ধরবার জন্যে ।

কিন্তু তিনিও অতো সহজে ধরা দেওয়ার পাত্র নন । তিনি ইংরেজদের চোখে ধূলো দিয়ে এক সঙ্গীকে নিয়ে সরে পড়েন আরবে । ও-দেশটা তখন তুরস্কের অধীন । তিনি ভাবলেন, সেখানে বসেই তুরস্কের শত্রু ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ব্যবস্থা করবেন ।

সে ব্যবস্থা কিছুটা এগোয়ও । কিন্তু দুর্ভাগ্য, তিনি এবারও পড়েন বিপাকে । ইংরেজদের ষড়যন্ত্রে আরবে হয় এক বিদ্রোহ । তুরস্কের বিরুদ্ধে । আর বিদ্রোহীরা মাহ্‌মুদুল হাসান আর তাঁর সঙ্গীকে ধরে তুলে দেয় ইংরেজদের হাতে । ইংরেজরা তখন তাঁদের মাল্টা দ্বীপে আটকে রাখে।

তাঁরা ছাড়াপান ১৯২০ সালে । তখন আর সরাসরি লড়াইয়ে নামবার কোনো সুযোগ নেই । তাছাড়া তাঁর বয়স হয়েছে অনেক । আগের মতো আর ছুটোছুটি করতে পারেন না ।

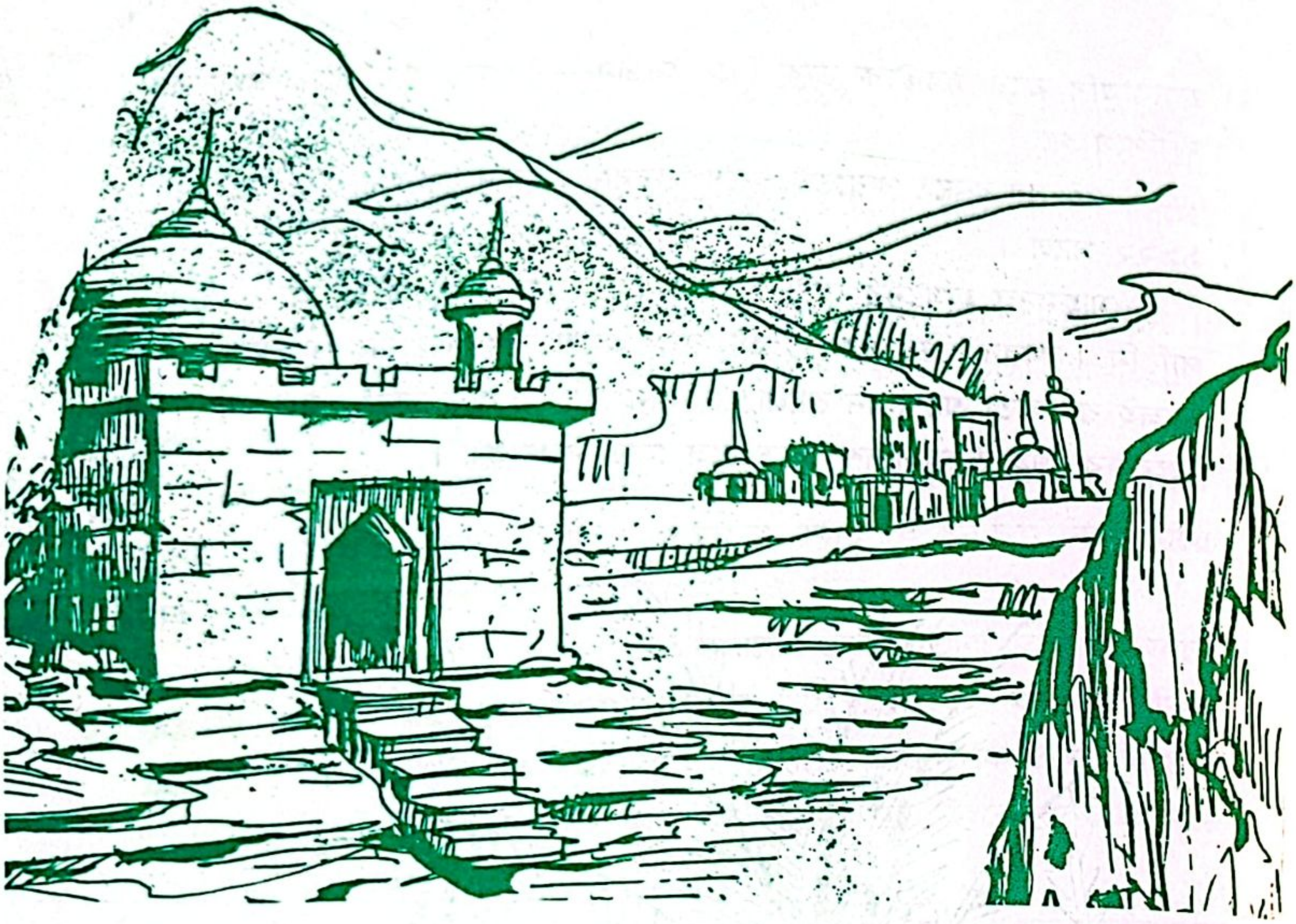
তবু বসে থাকবার মানুষ তিনি নন । দেশে ফিরেই যোগ দেন খেলাফত আন্দোলনে । সে আন্দোলনও ইংরেজের বিরুদ্ধে । সেই সঙ্গেই যতো দূর পারেন,

ঘোরাঘুরি করে সবাইকে ডাক দিয়ে বেড়ান— তোমরা স্বাধীনতার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ো ।

এই সব করতে করতেই, দেশে ফেরবার বছর দুয়েক পর, তাঁর মৃত্যু হয় । ১৯২২ সালে ।

মাহ্‌মুদুল হাসানের চেষ্টা তখন সফল হয়নি । তবু তাঁকে আমরা ভুলতে পারিনি । কারণ, তাঁর এবং তাঁরই মতো আরো কিছু সংগ্রামীর প্রাথমিক চেষ্টার ফলেই স্বাধীনতা আন্দোলন ভালোভাবে দানা বাঁধে । আর তারই দরুন শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা এই উপমহাদেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয় ।





ইতিহাস কাকে বলে

আজ থেকে প্রায় এক হাজার বছর আগের কথা।

তিউনিসের এক অল্প বয়সী ভদ্রলোক। পড়াশোনা করতে তাঁর খুব ভালো লাগে। সেকালে তো বইপত্র বেশি পাওয়া যেতো না। যা দু'-চারখানা মিলতো, তাও ছিলো হাতে লেখা আর যোগাড় করাও খুব কষ্টকর। কিন্তু তাঁর কাছে কষ্ট-টষ্ট মামুলি ব্যাপার। তিনি কোথাও কোনো বইয়ের সন্ধান পেলেই তা যোগাড় করবার চেষ্টা করেন। আর সেটা যদি সম্ভব নাই হয়, মওকা খুঁজতে থাকেন, কিভাবে বইখানা পড়ে নেয়া যায়।

এমন যাঁর পড়বার শখ, বুঝতেই পারছো, তিনি শুধু এক বিষয়ের বই নিয়ে বসে থাকতেন না। হ্যাঁ, বলতে গেলে— হাতের কাছে যা পেয়েছেন, তা-ই পড়ে ফেলেছেন। তবে আর সব পাঠকের মতোই তাঁরও দুই-একটা প্রিয় বিষয় ছিলো। তিনি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন ইতিহাসের বই পড়তে।

অথচ রীতিমতো উলটো ব্যাপার, বইগুলো তাঁর ভালো লাগতো না! মনে প্রশ্ন জাগে, ইতিহাস কাকে বলে?

কিন্তু কেন ? না, এই জন্যে। তিনি ইতিহাসের যেসব বই পড়তেন, সেগুলোতে থাকতো শুধু রাজরাজড়ার কথা। তাঁরা কতো বড়ো বীরপুরুষ, কতো দুশমনকে শেষ করেছেন, কতো রাজ্যি দখলে এনেছেন, কতো তাঁদের ধনদৌলত, লোক-লস্কর, দাস-দাসী, এই সব। ভদ্রলোকের এ সবে মন ভরে না। তিনি ভাবেন, রাজা-বাদশাহ্ তো হাওয়ায় ভেসে বেড়ান না, কোনো না কোনো দেশে বসত করেন, সেখানেই রাজত্ব করেন। আর সেসব দেশে তাঁরা ছাড়াও আরো অনেক মানুষ থাকে, আর থাকে তাদের সমাজ এবং সভ্যতা। শুধু যুদ্ধটুদ্ধ নয়, আরো কতো ঘটনা ঘটে তাদের দেশে,— যেগুলির কথাও রাজরাজড়াদের কাহিনীর মতনই মনে রাখবার মতো। তাহলে সেই সব মানুষ, তাদের সমাজ-সভ্যতা, বড়ো বড়ো ঘটনা ইত্যাদির কথা ইতিহাসে লেখা হবে না কেন ?

নিশ্চয়ই হবে, আর তা লিখবেন তিনি নিজেই, যাঁর নাম— হ্যাঁ, নামটা তোমাদের এতোক্ষণও বলা হয়নি, নামটা যাঁর ইবনে খালদুন।

আমরা অবশ্যি তাঁকে এই ছোট্ট নামেই জানি। কিন্তু আসল নামটা তাঁর বেশ বড়ো। ওয়ালী আলদীন আবূ যায়েদ আবদুর রহমান বিন মোহাম্মদ ইবনে খালদুন। এতো বড়ো নাম মনে রাখা কষ্টকর। তবে জানা থাকা ভালো। আমরা অবশ্যি এখানে সংক্ষেপে শুধু ইবনে খালদুনই বলবো। সারা দুনিয়ায় তিনি এই নামেই পরিচিত। এবং পরিচিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লেখা 'ইতিহাসের স্রষ্টা' হিসেবে। যে সব তথ্য থাকলে, যেসব জিনিসের বর্ণনা দিলে কোনো দেশের ইতিহাস সম্পূর্ণ এবং মিষ্টি হয়ে ওঠে, সেগুলি প্রথম পাওয়া যায় তাঁরই লেখা ইতিহাস বইতে। পরে সভ্য জগতের বিশেষ করে, ইউরোপের সব বড় ইতিহাসকারই ইতিহাস লেখার ব্যাপারে তাঁকে ওস্তাদ বলে মেনে নিয়েছেন।

ইবনে খালদুন বলতেন, একটা দেশের সমাজে, রাজনীতিতে নানারকম ঘটনা ঘটে। এমনিতে মনে হতে পারে, এগুলির কোনোটির সাথে কোনোটির কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে, এগুলি একেবারে সম্পর্ক ছাড়া নয়। এমনিভাবে, একটি দেশ বা জাতির উত্থান আর পতনের মধ্যেও একটা সম্পর্কের সূত্র থাকে। যা কারণগত। এই কারণগত সম্পর্কটা আবিষ্কার করে ইতিহাস লেখবার কায়দাটিকেই বলা হয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। ইবনে খালদুন নিজে এই পদ্ধতি মেনে চলেছেন এবং পরে সব বড়ো ইতিহাসকারই তাঁর পদ্ধতিতে ইতিহাস বই লিখেছেন।

'ইতিহাসের স্রষ্টা' এই ইবনে খালদুনের জন্ম হয় হিজরী ৭৩২ সালের পয়লা রমযান (ইংরেজি ১৩৩২ খৃস্টাব্দের ২৭শে মে) এবং মৃত্যু হয় ৮০৮ সালের পঁচিশে

রমযান (১৪০৬ খৃস্টাব্দের ১৬ই মার্চ)। তাঁর পূর্ব পুরুষেরা ছিলেন আরবের বাসিন্দা। মুসলমানরা যখন স্পেন জয় করে, তখন তাঁরা সেখানে চলে যান। কিন্তু পরে উত্তর আফ্রিকায় আসেন। সেখানেই তিউনিস শহরে ইবনে খালদুনের জন্ম হয়।

তাঁর লেখাপড়া শুরু হয় বাড়িতেই, বাবার কাছে। সেকালের নিয়ম অনুসারে তাঁর পড়াশোনার সূচনা ঘটে কুরআন শরীফ দিয়ে। ছাত্র হিসেবে তিনি ছিলেন দারুণ মেধাবী। তার ফলে খুব অল্প বয়সেই হাফেজে কুরআন হয়ে যান।

তারপর চলে তাঁর অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা। বিশেষ করে কুরআন শরীফের তফসীর, হাদীস শরীফ আর শরীয়তে। সবই বাড়িতে।

এবার বাইরের শিক্ষার পালা। তখন কিন্তু শুধু কুরআন-হাদীসের শিক্ষা নয়। তিনি পড়তে লাগলেন আইন, দর্শন, তর্কশাস্ত্র, সাহিত্য, ইতিহাস—এই সব। তখনকার তিউনিসের নামকরা শিক্ষক আর পণ্ডিতদের কাছে। এদিকে তিনি তো ভালো ছাত্র ছিলেনই। সব মিলিয়ে তাই ফল দাঁড়ায়, অল্প বয়সেই পণ্ডিত হিসেবে তাঁর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পরে তিনি তাঁর এই ছাত্রজীবনের কথা বিস্তারিতভাবে লিখে রেখে যান।

যা-ই হোক—তাঁর বয়স তখন মাত্র আঠারো বছর— হঠাৎ তাঁর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। না, টাকা-পয়সার অভাব বা এমনি অন্য কোনো অসুবিধার দরুন নয়, এক দুর্যোগের কারণে। সেবার তিউনিসে দেখা দেয় এক ভয়ানক রোগ, প্লেগ। তাতে প্রায় সারা তিউনিস উজাড়। ইবনে খালদুনের বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন তো দূরের কথা, বন্ধুবান্ধবরাও শেষ হয়ে যান।

এমন নিঃসহায় অবস্থায় কেউ লেখাপড়ার কথা ভাবতে পারে না, ভাবতে হয় পেট চালানোর কথা। ঘটনাক্রমে এই সময় তালমিস্তান নামে একটি জায়গার শাসনকর্তা তাঁকে একটি চাকরি দেন। সরকারী 'লেখক'-এর। ইবনে খালদুন তাতে যেন অকূলে কূল পান। এদিকে শাসনকর্তা তাঁকে মানেনও খুব। ইবনে খালদুনের দিন তাই ভালোই চলতে থাকে।

কিন্তু তারপরই আবার কোথা থেকে কি যেন হয়ে যায়! ইবনে খালদুন দেখেন, মনিব তাঁর ওপর ভীষণ ক্ষাপ্পা। এমন ক্ষাপ্পা যে, তাঁকে পাকড়াও করে একদম কয়েদখানায় ঢুকিয়ে দেন।

রাজরাজড়ার মর্জি বোঝা ভার। কয়েদখানায় তাঁকে কতো দিন থাকতে হত, কে জানে। কিন্তু আবার একটা আকস্মিক ঘটনা ঘটে। তাঁর মনিবের মৃত্যু হয়। নতুন শাসনকর্তার হুকুমে ইবনে খালদুন খালাস পেয়ে যান।

এরপর কিছু দিন ঘোরাঘুরি। তবে খেয়ালখুশি মাফিক নয়, রীতিমতো পরিকল্পনা করেই বলতে গেলে। তা তিনি ঘুরলেন কোথায় ? উত্তর আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলিতে । ততো দিনে তিনি রাজনীতি শুরু করে দিয়েছেন । এ ব্যাপারে তাঁর মত ছিলো ঃ রাজনীতি হবে মানুষকে নিয়ে, সমাজ নিয়ে । তিনি যখন যেখানে যেতেন, বক্তৃতা করতেন এই সব বলে । তিনি বক্তাও ছিলেন পাকা । যেমন বলবার ভঙ্গিতে, তেমনি পষ্ট ভাষায় তাঁর যুক্তি আর মতামত তুলে ধরতে । নিজের মতামতের ব্যাপারে তিনি কখনো কারো সাথে আপস করেননি । তার ওপর, তাঁর আত্মসম্মান-জ্ঞান ছিলো খুব কড়া । তার জন্যে তাঁকে অনেক সময় বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়েছে । তবু নিজের মতামত কখনো ছাড়েননি ।

উত্তর আফ্রিকায় ভ্রমণ সেরে তিনি সোজা গিয়ে ওঠেন স্পেনের গ্রানাডায় । তখন সেখানকার সুলতান আবূ আবদুল্লাহ্ । ইবনে খালদুনের নাম তাঁর কানে আগেই পৌঁছে গেছে । সুলতান ইবনে খালদুনকে প্রায় বুকে টেনে নেন, তাঁকে অভ্যর্থনা জানান রীতিমতো ধুমধাম করে ।

কিন্তু বেকায়দা কাণ্ড ঘটে গ্রানাডাতেও । নানান ব্যাপার নিয়ে । ইবনে খালদুন চেয়েছিলেন, বাকি জীবনটা গ্রানাডা শহরেই কাটিয়ে দেবেন । জায়গাটা তখন তাঁর মতো মানুষের থাকবার মতও বটে । সেখানে সে সময়ে অনেক গুণী-জ্ঞানীর বাস। তাঁদের কদরও খুব । কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ইবনে খালদুনের মনের সাধ পুরো হয় না, গ্রনাডার বাস উঠিয়ে অল্পকাল পরই তাঁকে ফিরে আসতে হয় তিউনিসে। গ্রানাডাতে তিনি শুরু করেছিলেন বিশাল একখানা বই লেখা । যে বই পরে হয়ে দাঁড়ায় তাঁর সেরা কীর্তি । তখনকার মতো বইখানা অসমাপ্ত থেকে যায় ।

তিউনিসে এবার তিনি থাকেন চার বছর । তারপর চলে যান মিসরে । চিরকালের মতো তিউনিস ছেড়ে ।

মিসরে গিয়ে তিনি প্রথমে ওঠেন আলেকজান্দ্রিয়া শহরে । তারপর যান কায়রোয় । সে শহর তার মতো গুণী মানুষকে যেন লুফে নেয় । কায়রোর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম দুনিয়াজোড়া, সেই আমল থেকেই । তার কর্তাব্যক্তিরা বিনীত অনুরোধ জানান, আপনি কি আমাদের এখানে অধ্যাপনা করবেন ?

ঃ করতে পারি । তা বিষয়টা কি ?

ঃ ধর্ম ।

ইবনে খালদুন রাজী হয়ে যান ।

কিছু কাল পর আসে আর এক প্রস্তাব। এবার খোদ সুলতানের কাছ থেকে। তিনি চান ইবনে খালদুনকে এক জায়গায় কাযী বানাতে।

সুলতানের অনুরোধটা তাঁকে রাখতে হয়। ইবনে খালদুনের জীবনের শেষ দিকটা কাটে নানান কাজে। কখনো ঘরে বসে পড়াশোনা করেন। কখনো সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর মতামত নিয়ে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান। কখনো লেগে যান লিখতে। আবার রাজনীতিও করেন মাঝে মাঝে।

তবে যতো যা-ই করুন, মন সবচেয়ে বেশি পড়ে থাকে লেখায়। লেখবার বিষয়ও নানা রকম। ধর্ম, দর্শন, আইন, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস— এমনি সব। এমনকি, কখনো কখনো কবিতা আর তার সমালোচনাও। শেষের কাজের ঝোঁকটা তিনি পেয়েছিলেন বাবার কাছ থেকে, তাঁর বাবা ছিলেন সে আমলের একজন নামকরা কাব্য সমালোচক।

ইবনে খালদুনের সবচেয়ে নামকরা বই 'কিতাব উল-ইবার' —যা তিনি লিখতে শুরু করেছিলেন গ্রানাডায়। বইখানায় তিনি সেকালের সমস্ত জানা দেশ আর জাতির ইতিহাস লিখে রেখে গেছেন। আকারে বইখানা বিরাট। তার সাতটি খণ্ড। এর ভূমিকা অংশে তিনি সমাজবিজ্ঞান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সে আলোচনার ছয়টি অংশ। সেগুলোর বিষয়—১. মানবসমাজ এবং তার শ্রেণীভেদ, ২. যাযাবর সমাজ এবং তার শ্রেণীভেদ, ৩. রাষ্ট্র এবং তার শ্রেণীভেদ আর শাসনব্যবস্থা, ৪. সমাজ এবং সভ্যতা, ৫. সমাজ এবং অর্থনীতি, ৬. ইতিহাস। একটু ভেবে দেখো, জ্ঞান কতো গভীর হলে একটা বিষয় নিয়ে এতো বিস্তারিত আলোচনা করা যায়।

বই শেষ করবার পর তিনি সুলতান আবদুল আজিজের কাছে নিয়ে যান। সুলতান তো তা পড়ে মহাখুশি। ইবনে খালদুনকে দু'হাত ভরে দামী দামী উপহার দেন।

পরে এই বইখানা ইউরোপের অনেক ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

ইবনে খালদুনের জীবনের শেষ পঁচিশ বছর কাটে মিসরে। তখন ওই দেশটাই হয়ে যায় তাঁর নিজের দেশ। তিউনিস আর স্পেন থেকে বার বার অনুরোধ এসেছে, আপনি আমাদের এখানে এসে থাকুন। কিন্তু তিনি মিসর ছেড়ে নড়েননি।

এই দেশে থাকতেই তাঁর জীবনে ঘটে আর এক বিরাট দুর্ঘটনা। যেমন ঘটেছিলো তিউনিসে, তাঁর আঠারো বছর বয়সে। পেট চালানোর ধান্ধা একটু মিটাতেই তিনি ঘরসংসার করেন। কিন্তু তিনি তো ঘুরে বেড়ান যাযাবরের মতো।

তাই পরিবার সঙ্গে রাখতে পারেন না। শেষে মিসরে যখন তিনি একটু সুস্থির হয়ে বসেছেন, তখন তিউনিসে খবর পাঠান, তোমরা এবার আমার কাছে চলে এসো।

বাড়ির লোকজন তো সেই খবর পেয়ে দারুণ খুশি। পয়লা মওকাতেই কায়রোমুখী এক জাহাজে উঠে বসেন।

এদিকে ইবনে খালদুনের মনেও দারুণ খুশি। কতোকাল পর তিনি আপনজনদের সাথে বাস করতে পারবেন! তিনি তাই কেবল দিন গুনতে থাকেন। কবে সেই জাহাজখানা কায়রোয় এসে পৌঁছবে!

এই পথ চেয়ে থাকার মধ্যেই একদিন আসে এক বুকভাঙা খবর। জাহাজখানা প্রচণ্ড ঝড়ে পড়ে ডুবে গেছে। তার লোকজন, মালমাত্তা, কিছুই বাঁচেনি।

খবরটা শুনে ইবনে খালদুন শোকে যেন পাথর হয়ে যান।

কিন্তু সে কেবল কিছু দিনের জন্যে। তারপরই আবার হয়ে যান আগের মানুষটি। কাজকর্ম করতে থাকেন আগের মতনই।

যাঁরা আসল জ্ঞানী মানুষ, সত্যিকার মহাপুরুষ, তাঁদের মনের জোর এমনিই হয় বটে।





এ্যালজেব্রার নামের গোড়া

স্কুলে তোমরা অনেকেই এ্যালজেব্রা শেখো। ওই যে— বাংলায় যাকে বলে বীজগণিত, সেই জিনিসটা। যার সাহায্যে কঠিন সমস্যার সমাধান করা যায়, বিশেষ করে তার কিছু সূত্র বা ফর্মুলা মনে রাখলে। এ্যালজেব্রা তাই ভারী দরকারী আর মজার জিনিস।

কিন্তু তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো, এমন মজার আর দরকারী এ্যালজেব্রা তার নামটি কোথা থেকে পেয়েছে ?

সেও এক মজার কথা। 'এ্যালজেব্রা' শব্দটি এখন আমাদের কাছে ইংরেজি বলে চালু। কিন্তু আসলে এটা এসেছে আরবী থেকে। পারস্যের এক বিজ্ঞানীর একখানি বইয়ের নামে ছিলো শব্দটি। ইউরোপের লোকেরা তাকে বিকৃত করে বানিয়ে ফেলে ওই শব্দটি, 'এ্যালজেব্রা'। বইখানির নাম ছিলো 'ইল্‌ম্ আল-জিবর ওয়াল মুকাবিলা'। 'এ্যালজেব্রা' এই নামটিরই ভিতরকার 'আল-জিবর'-এর বিকৃত রূপ।

আর এক মজার কথা, ইউরোপের লোকেরা শুধু ওই শব্দটিই বিকৃত করেনি, করেছে যাঁর বইয়ের নাম থেকে শব্দটি নেয়া, তাঁর নিজের নামটিও। আর তার ফলে চালু হয় গণিতের একটি শাখার নাম। কিন্তু সেকথা পরে। যাঁকে নিয়ে এতো কথা, এসো আগে তাঁর কিছু পরিচয় জেনে নিই।

এই বিজ্ঞানীকে আমরা সংক্ষেপে বলি আল-খারেজমী। আসল নামটা তাঁর রীতিমতো লম্বা। আবূ আবদুল্লাহ্ মোহাম্মদ ইবনে মূসা আল-খারেজমী। তবে এ নাম লেখা বা বলা হয় কদাচিৎ। শুধু যখন তাঁর পুরো পরিচয় দেওয়ার দরকার পড়ে, তখন। নইলে কেতাবেই থেকে যায়।

বুঝতেই পারছো, যাঁর বইয়ের নাম থেকে 'এ্যালজেব্রা' শব্দটির জন্ম, তিনি ছিলেন অনেক কাল আগের মানুষ । 'এ্যালজেব্রা' শব্দটিই তো এখন অন্তত শ'পাঁচেক বছরের পুরোনো । আর আল-খারেজমীর 'ইল্‌ম্‌ আল-জিবর ওয়াল-মুকাবিলা' নামের বইখানা লেখা হয়েছিলো আরো প্রায় দু'শো বছর আগে। তার মানে, তাঁর জন্ম ইংরেজি অষ্টম শতাব্দীর কোনো সময়ে । দুঃখের বিষয়, আজও তাঁর সঠিক জন্ম তারিখটা পাওয়া যায়নি । শুধু অনুমানে বলা হয়, তারিখটা ছিলো ৭৮০ সালের কাছাকাছি । তবে তাঁর মৃত্যুর তারিখের মোটামুটি একটা হিসেব মিলেছে । তিনি মারা যান খুব সম্ভব ৮৪৭ সালে ।

আল-খারেজমীর জন্ম হয় খারেজম নামে একটি জায়গায় । তার থেকেই তাঁর পরিচয় দাঁড়ায় আল-খারেজমী । জায়গাটি আরল হ্রদের দক্ষিণে খিবা এলাকায় । সে আমলে এলাকাটি ছিলো পারস্য— মানে কিনা, ইরানের অধীন । এখন সোভিয়েত রাশিয়ার ।

তাঁর ছোটবেলাটা আমাদের কাছে একেবারেই অন্ধকার । তার কোনো কথাই আমরা জানতে পারিনি । পরের জীবনের কথাও জানা গেছে খুবই কম । তবে তাঁর যে ছোটবেলা থেকে পড়াশোনার দিকে খুব ঝোঁক ছিলো, তা সহজেই ধরে নেয়া যায় । বাগদাদের খলীফাদের তখন দুনিয়াজোড়া নামডাক । যেমন ধনদৌলতে, তেমনি জ্ঞানেগুণে। এই খলীফাদের একজন আল-মামুন । তিনি জ্ঞানবিদ্যা বড়ো ভালোবাসতেন আর তাই জ্ঞানী-গুণীদের আদর করতেন দারুণ। তাঁর ছিলো এক বিশাল লাইব্রেরী । আল-খারেজমীকে তিনি সেই লাইব্রেরীর কর্তা করে বসিয়ে দেন । তেমন যোগ্য আর গুণী মানুষ না হলে কি আর আল-খারেজমী এতো বড়ো চাকরিটি পেতেন ?

আসল কথা হল, খলীফা আল-মামুন নিজেও ছিলেন খাঁটি গুণী মানুষ । তাই অন্য গুণী মানুষ দেখলেই চিনতে পারতেন । আল-খারেজমীকে তিনি এমনি করেই তাঁর লাইব্রেরীতে এনে তুলেছিলেন । সেই যে কথায় বলে না, জহুরীই জহুর চেনে, এ হচ্ছে তাই । আর আল-খারেজমীও যে খাঁটি জহুর —মানে, জওহর বা রত্ন ছিলেন, তার প্রমাণ মিলেছে অন্যভাবেও । খলীফা আল-মামুন পরে তাঁকে নিজের দরবারেও আসন দেন । এই খলীফার দরবারে আসন পেয়েছিলেন সেকালের সেরা জ্ঞানী-গুণীরা । আল-খারেজমী সেই দলের সব সেরাদের একজন । তিনি খলীফা আল-মামুনের পরেও বেঁচে ছিলেন তেরো-চৌদ্দ বছর ।

সেই সময়কার এক ঘটনা ।

তখন বাগদাদের খলীফা আল-ওয়াসিক । তিনি একবার পড়লেন সাংঘাতিক

অসুখে। তাঁর মনে তখন শুধু ভয়, তিনি আর বাঁচবেন না। তবু আশা কি কেউ একেবারে ছেড়ে দিতে চায় ? আল-ওয়াসিক তাই ঠিক করলেন, তিনি আর সত্যিই বাঁচবেন কিনা, সেটা গণকদের কাছ থেকে জেনে নেবেন।

গণক মানে— জ্যোতির্বিদ বা জ্যোতিষী। সেকালের লোকের ধারণা ছিলো— একালেরও অনেকেরই আছে— গ্রহ, তারা ইত্যাদির অবস্থানের হিসেব করে জ্যোতিষীরা ভবিষ্যতের কথা বলে দিতে পারেন। খলীফার দরবারে তখন জ্যোতিষী অনেক। তাঁদের ভেতর একজন আল-খারেজমী। হায়াত-মউতের কথা, ভবিষ্যতের কথা যে কেউ বলতে পারে না, এটা তাঁরা জেনেও জানতেন না। তাই খলীফার হুকুম পেয়ে তাঁরা বসলেন তাঁর আয়ুর হিসেব করতে।

হিসেব সেরে তাঁরা খলীফাকে জানালেন, আপনি আরো অনেক দিন বাঁচবেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁর অসুখ আর সারেনি।

তাই বলে আল-খারেজমী বা তাঁর সঙ্গীরা যে জ্যোতির্বিদ্যা বাতিল করে দিলেন, তা নয়। তার কারণ, ওই যে— তাঁরা তখন ভাবতেন, ওই বিদ্যার জোরে ভবিষ্যতের কথা বলে দেওয়া যায়।

এই বিশ্বাসে আল-খারেজমী জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন সারা জীবন। জ্যোতির্বিদ্যার ওপর লেখা তাঁর নাকি বেশ কয়েকখানি বই ছিলো। সেগুলোর মধ্যে একখানির বিষয় হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে তাঁর নবুয়ত লাভের মিল। দুঃখের বিষয়, এসব বই এখন আদৌ পাওয়া যায় না।

জ্যোতির্বিদ্যার আসল কাজ হচ্ছে আকাশের খবর জানা। মানে— চাঁদ, তারা, সূর্য ইত্যাদির। আল-খারেজমী সে কাজও কম করেননি।

একবার খলীফা আল-মামুন তাঁর দরবারের জ্যোতির্বিদদের ডেকে বললেন, আকাশের একটা নকশা চাই। ও জিনিস না থাকলে কি জ্যোতির্বিদ্যার কাজ চলে ?

ঃ হ্যাঁ, জাহাঁপনা, অসুবিধা কিছু হয় বটে।

ঃ তাহলে আপনারা কাজে লেগে যান।

আল-খারেজমী কাজে লেগে গেলেন।

তার ফলে তৈরি হল আকাশের সুন্দর একখানা নকশা। চাঁদ-তারা-সূর্যের অবস্থান, কক্ষপথ ইত্যাদি দেখিয়ে।

এখানে তোমাদের বলে রাখি, শুধু আকাশের নকশা নয়, পৃথিবীর নকশা তৈরিতেও আল-খারেজমী ছিলেন পাকা। পৃথিবীর নকশা মানে— ওই যে, আমরা

এখন যাকে বলি মানচিত্র, তা-ই । এ জিনিস তৈরি করতে হলে ভূগোলের ভালো জ্ঞান থাকা চাই । তাও আল-খারেজমীর ছিলো ।

আর সেই জ্ঞানের জোরে তিনি পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে সুন্দর একখানি বই লেখেন । নাম তার 'কিতাবুস সুরাত আল-আর্দ্' । বইখানির হাতে লেখা কপি এখনো পাওয়া যায় ।

পাওয়া যায় তাঁর জ্যামিতির বইয়ের কপিও । ওই হাতে-লেখা অবস্থায় । তার মানে, জ্যামিতিতেও তিনি ছিলেন ওস্তাদ । শোনা যায়, জ্যামিতিকে তিনি অনেক সহজ করে দেন । বোঝানোর কৌশলে । আগে জিনিসটা বড্ড কঠিন ছিলো ।

কিন্তু দেখো, গোড়ায় যা বলেছিলাম, তার থেকে কোথায় চলে এসেছি ! জ্যোতির্বিদ্যায় অঙ্ক লাগে। ভূগোলেও । আর জ্যামিতি তো গণিতেরই একটি শাখা । কিন্তু আল-খারেজমীর আসল নাম যাতে, সেই বীজগণিতের কথা বলতে গিয়েও বলা হয়নি ।

তা এতোক্ষণ যখন বলা হয়নি, তখন থাক না আরো কিছুক্ষণ মুলতবি । আর সেই অবসরে আল-খারেজমীর আর একটি কাজের কথা বলে নিই ।

এ কাজটা হল শুদ্ধ গণিতের । সংখ্যা লেখার । এই বিষয়টি নিয়েও তিনি মাথা ঘামিয়েছিলেন অনেক । পণ্ডিতরা বলেন, আরবদের মধ্যে সহজ কায়দায় সংখ্যা লেখাটা তিনিই চালু করেন । ভারতের সংখ্যা লেখার কায়দা দেখে। এর আগে আরবদের ভেতর বড়ো বড়ো সংখ্যা লেখা হত আরবীর এক-একটি অক্ষর দিয়ে । আল-খারেজমী এবং তাঁর আমলের আরও কিছু পরেকার মুসলিম বিজ্ঞানীরা অক্ষরের জায়গায় ব্যবহার করতে থাকেন সংখ্যা। এটা তাঁদের লেখা থেকে ইউরোপেও চালু হয়ে যায় । সেকালে ইউরোপের লোকেও অক্ষর ব্যবহার করতো । অক্ষর বাদ দেওয়ায় বড়ো সংখ্যা লেখা খুব সহজ হয়ে পড়ে ।

শুদ্ধ গণিত নিয়ে আল-খারেজমী যে গবেষণা করেছেন, তার সবই লিখে রেখে গেছেন বইয়ের আকারে । সেসব বইয়ের একখানির নাম 'কিতাবুল হিন্দ' । হিন্দ মানে, ভারতের সংখ্যা লেখার কায়দা নিয়ে বইখানি লেখা । সে জন্যেই এর নাম দেন তিনি 'কিতাবুল হিন্দ' বা 'ভারতের বই' । শুদ্ধ গণিতের তাঁর আর একখানি বইয়ের নাম 'আজ্জাম ওয়াৎ-তাফরিক' । এছাড়াও বিষয়টি নিয়ে তিনি আরো কয়েকখানি বই লেখেন । 'কিতাবুল হিন্দ' আর 'আজ্জাম ওয়াৎ-তাফরিক'-এর ল্যাটিন অনুবাদ এখনো ইউরোপে পাওয়া যায় । মুসলিমদের দুর্ভাগ্য, আগে ইউরোপের লোকেরা তাদের বই অনুবাদ করতো, এখন তারাই ইউরোপের লেখকদের বই অনুবাদ করে । চাকা কেমন উলটে গেছে !

সে যা-ই হোক, আল-খারেজমীর বইয়ের ল্যাটিন অনুবাদ থেকেই ঘটে আর এক মজার ব্যাপার। যার আভাস তোমাদের গোড়াতেই দিয়েছি।

'আজ্‌জাম ওয়াৎ-তাফরিক'-এর অনুবাদ করবার সময় ল্যাটিন ভাষায় তাঁর নামটা লেখা হয় 'আলগোরিথম'। তার থেকে ক্রমে বেরোয় 'লগারিদম' বলে একটা শব্দ। আর সেই শব্দটা ব্যবহার করা হতে থাকে গণিতের একটি নতুন শাখার নাম হিসেবে!

'লগারিদম' তোমরা পাবে এস.এস.সি-র পরে। যদি অঙ্ক পড়ো। তখন দেখবে, এ জিনিসটা অনেক কঠিন অঙ্ক সহজ করে দেয়। খাটনি বাঁচিয়ে।

খলীফা আল-মামুনের লাইব্রেরীতে ঢুকে আল-খারেজমী প্রথম যে কাজটি করেছিলেন, সেটি বোধ হয় জ্যোতির্বিদ্যার একটি তালিকা। এর জন্যে তিনি সাহায্য নেন 'সিরহিন্দ' নামে একখানি বইয়ের। বইখানি ভারতের কোনো গণিতবিদের লেখা। আরবীতে অনুবাদ করেছিলেন আল-খারেজমীর কিছু কাল আগের এক বিজ্ঞানী। নাম ছিলো যাঁর আল-ফাজারী। এরপর আস্তে আস্তে তিনি বীজগণিতের চর্চায় ডুবে যান। বইও লেখেন অনেকগুলি।

তাঁর আগে বীজগণিতের চর্চা অমনভাবে কেউ বড়ো একটা করেন নি। তখন বীজগণিতের ছিলো শুধু আরম্ভটা। ভারতে আর গ্রীস দেশে ডায়োফ্যান্টাস নামে এক ভদ্রলোকের লেখা পড়ে আল-খারেজমী বীজগণিত নিয়ে খুব ভাবতে থাকেন। আর সেই ভাবনা চলে সারা জীবন। এরই জন্যে তিনি গণিতের দুনিয়ায় অমর হয়ে আছেন।

বীজগণিতে আল-খারেজমীর সবচেয়ে বড়ো কাজ কি? না, যার শুধু আরম্ভটা ছিলো, তাকে বিকাশ আর উন্নতির পথে এগিয়ে নেয়া। হ্যাঁ, বীজগণিতকে তিনি অনেক দূরে এগিয়ে নেন। নতুন নতুন অংক তৈরি করে আর সেসবের সমাধান দিয়ে।

অথচ তাঁর এসব কাজের সাথে আগেকার বীজগণিতবিদদের কাজের বিশেষ কোনো মিল ছিলো না। তিনি বের করেন নতুন নতুন নিয়ম।

তোমাদের হয়তো আরো খোলাসা করে, আরো বিস্তারিতভাবে তাঁর কাজের কথা জানতে ইচ্ছে হচ্ছে। আমারও মন চাইছে বলতে। কিন্তু মুশকিলের ব্যাপার, এগুলো তোমরা ঠিক বুঝবে না। বড়ো হয়ে জেনে নিও।

আপাতত আমি শুধু আর একটি খবর দিয়ে আল-খারেজমীর কথা শেষ করি।

আল-খারেজমীকে একবার একটি দলের সাথে আফগানিস্তানে পাঠানো হয় । শোনা যায়, এরপর তিনি ভারতেও ঘুরে যান । লোকে বিদেশে গেলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শুধু নতুন নতুন জিনিস কিনে আনে, যেগুলি তাদের নিজেদের দেশে মেলে না । আর তারপর বড়জোর ভ্রমণকাহিনী লেখে। কিন্তু আল-খারেজমী ছিলেন অন্য ধরনের মানুষ । তিনি বিদেশ থেকে নিয়ে আসেন জ্ঞান । আর সেই জ্ঞান তাঁর বিজ্ঞান চর্চায় পুরোপুরি কাজে লাগান বিশেষ করে গণিতে । মানুষ কি এমনিতেই বড়ো হয় ?



জ্ঞানের সাধক গুণের আধার

সবশেষে তোমাদের শোনাবো আমাদেরই দেশের আর এক মস্ত গুণী লোকের কথা। যেমন গুণী ছিলেন ডাঃ মোহাম্মাদ ইব্রাহিম। কিন্তু তার আগে একটা গল্প বলে নিই, গল্প ঠিক নয়, একটা ঘটনার কথা। যেটা আমার সামনেই ঘটেছিলো। কিংবা বলতে পারো, আমাকে নিয়েই।

ঘটনাটা আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগের।

সেদিন ভদ্রলোক তাঁর প্রকাশকের কাছে যাবেন। তাঁর একখানা প্রবন্ধের বইয়ের পাণ্ডুলিপি নিয়ে। প্রকাশকের সাথে কথাবার্তা আগেই হয়েছিলো। এখন বাকি শুধু পাণ্ডুলিপি দিয়ে আসা। প্রবন্ধগুলো গোছাবার সময় আমি এক-আধটু সাহায্য করেছিলাম। বোধ হয় সে জন্যেই বেরুনোর সময় আমাকে বললেন, তুমিও চলো।

তিনি মুরুব্বী মানুষ। তাই তাঁর কথাটা মানতে হল।

বেরুলাম আমরা সন্ধ্যার পর। পথে তাঁর অন্য একটি জায়গায় সামান্য কাজ ছিলো। ঘটনাটা ঘটে সেখানেই।

সেখানে তিনি কথা বলতে লাগলেন একটা ছোট্ট টেবিলের পাশে বসে। টেবিলটা প্রায় খালিই। তার ওপর পড়ে আছে শুধু লাল রঙের একখানা গল্পের বই। কথাবার্তা যখন শেষ হয়ে আসছে, তখন দেখি, ভদ্রলোক বইখানা নিজের দিকে টেনে নিচ্ছেন।

বেরুনোর সময় আমি তাঁর হাতে কোন বই দেখিনি। তাই মনে হল, তিনি ভুল করে বাড়ির মালিকের বই টেনে নিচ্ছেন। মানুষটা আবার আপনভোলা। ভুল করা তাই তাঁর পক্ষে বিচিত্র নয়। সুতরাং এক ফাঁকে বইখানা টেনে নিলেন।

এবার আমি মনে মনে ভয় পেয়ে গেলাম। আমার পক্ষে তো তাঁর মতো মুরুব্বীকে কিছু বলতে যাওয়া সম্ভবই নয়। ওদিকে বাড়ির মালিকের কাছেও তিনি মুরুব্বী। বইখানা যদি তিনি নিয়েও যান, মালিক কিছু বলতে পারবেন না। ব্যাপারটা যতোই বিচ্ছিরি হোক না কেন।

তাহলে উপায় ?

উপায় আর কি ? এক ফাঁকে সাহস করে আবার বইখানা আমি সরিয়ে রাখলাম। যখন তিনি আগের মতোই গৃহকর্তার মুখের দিকে চেয়ে কথা বলছেন।

কিন্তু কাণ্ড দেখো, তিনি এবারও বইখানা নিজের দিকে টেনে নিলেন। গৃহকর্তার দিক থেকে মুখ না ফিরিয়েই।

আমার তখন চুপ করে থাকা ছাড়া আর উপায় রইলো না।

কিন্তু পথে বেরিয়ে আর চুপ করে থাকা সম্ভব হল না। বললাম, বইখানা কি আপনার ? বেরুনোর সময় আপনার হাতে দেখিনি কিনা—

তিনি কিন্তু চমকালেন না, খুব স্বাভাবিক গলায় বললেন, হ্যাঁ, আমারই। তুমি আগে খেয়াল করোনি।

তারপর কথায় কথায় জানালেন, তিনি যখন কোন কাজে বাইরে বেরোন, সঙ্গে একখানা বই রাখেন। কাজ সারবার আগে যদি অপেক্ষা করতে হয়, বইখানার যতোটা পারেন, পড়ে নেন। তাতে অপেক্ষার সময়টা কাজে লেগে যায়। ওটা আর অকারণে নষ্ট হল বলে মনে হয় না।

তাঁর কথা শুনে আমি তো থ'। সময়ের সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক গল্প পড়েছি। আমার চোখের সামনে এমনি একটা গল্প দেখবো, তা যে কখনো ভাবতেও পারিনি !

তিনি সময়ের যে কতোটা সদ্ব্যবহার করতেন, তা আমি পরেও দেখেছি। মাঝে মাঝে আমি তাঁর বাসায় যেতাম। কখনো দেখিনি, তিনি একা আছেন অথচ কাজের মতো কাজ কিছু করছেন না। একা অবস্থায় তাঁকে পেতাম লেখার টেবিলে, নয়তো বই হাতে কিংবা অন্য কোন কাজে।

এই ভদ্রলোককে তোমরা নিশ্চয়ই কখনো দেখনি। যদিও তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন খুব বেশি কাল আগে নয়। কিন্তু তাঁর নামটি নিশ্চয়ই সবাই জানো। আমি এতোক্ষণ বলছিলাম কাজী মোতাহার হোসেনের কথা।

সময়ের সদ্ব্যবহার করাই কিন্তু তাঁর একমাত্র গুণ ছিলো না। তাঁর ভেতর এমন অনেক গুণ দেখা গেছে, যেগুলি তাঁকে রীতিমতো এক মহাপুরুষ করে তোলে।

তাঁর এই সব গুণের মধ্যে একটি ছিলো— তোমরা যাকে বলো নিয়মানুবর্তিতা। মানে কিনা— সব কাজেই তার দরকার মতো একটা নিয়ম মেনে চলার অভ্যেস। কাজী মোতাহার হোসেন এই অভ্যেসটি খুব যত্নসহকারে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্মের একটু খোঁজ-খবর নিলেই এটা বোঝা যেতো।

তিনি সাধারণত ঘুম থেকে উঠতেন খুব ভোরে। হাত-মুখ ধোওয়া ইত্যাদির পর, খুব স্বাভাবিকভাবেই ফজরের নামায পড়া এবং কিছুক্ষণ কুরআন শরীফ তিলাওয়াত। তারপর 'মর্নিং ওয়াক' বা প্রাতঃভ্রমণ। এই কাজটিও তিনি করতেন একেবারে নিয়মিতভাবে। জীবনের শেষদিন তক। নেহাৎ অসুখ-বিসুখে বিছানায় পড়ে না থাকলে।

দিনের বাকি কাজগুলোও চলতো এমনি নিয়ম বেঁধে। যতো দূর সম্ভব।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তাঁর একটি বিশেষ নিয়ম ছিলো। যা আমাদের কারো নিয়মের সাথে মেলে না। রাতের খাবারটা তিনি খেয়ে নিতেন সাধারণত ছয়টার দিকে। একেবারে পেট ভরে। তারপর রাতে আর কিছু খেতেন না— নেহাৎ দরকার বোধ করলে শুধু দুই-একখানা বিস্কুট বা এক কাপ চা কিংবা এমনি কিছু খেয়ে নিতেন। তাঁর কথা ছিলো, রাতের খাবার এভাবে আগেই খেয়ে নিলে শরীর ভালো থাকে।

কাজী মোতাহার হোসেন ছিলেন জ্ঞানের সাধক। আমাদের দেশের এক বিরাট পণ্ডিত। তাঁর নামডাক আমাদের কাছে প্রধানত সেই হিসেবেই। তার কারণ জ্ঞানের যাঁরা সাধনা করেন, আমরা সাধারণত তাঁদের ভালোবাসি, ভক্তি-শ্রদ্ধা করি সেই সাধনার জন্যে, সাধনায় পাওয়া জ্ঞানের জন্যে। কেমন তাঁদের সাধনা, কি তার ফল, সেসব জানতে চাই বারবার, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। মানে কিনা— আমাদের কাছে তাঁরা বড়ো হয়ে থাকেন জ্ঞানের সাধক হিসেবেই। তাঁদের কাছ থেকে আমরা জ্ঞান সাধনার সবক নিই। এটা খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো, তাঁদের কাছ থেকে আমরা সবক নিতে পারি অন্য জিনিসেরও ?

পারি যে তার একটা প্রমাণ তো তোমরা ওপরের গল্পটি থেকেই পেয়েছো ।

আসল কথা কি জানো ? জ্ঞান মানুষকে নানান দিক থেকে বড়ো করে । তাই যাঁরা জ্ঞানের সাধক, তাঁদের জীবন থেকে আমাদের শিখবার থাকে অনেক কিছু । আমাদের কাছে তাঁরা আদর্শ পুরুষ ।

কাজী মোতাহার হোসেন জন্মেছিলেন ১৮৯৭ সালে । তখনকার ফরিদপুর জেলার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে, কিন্তু অজ পাড়াগাঁয়ে । সেখানে লেখাপড়া শেখবার সুযোগ বিশেষ ছিলো না । কিন্তু তাতে কি ? কাজী সাহেব ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনায় ছিলেন ভারী উৎসাহী আর মনোযোগী । তাই কোন অসুবিধাই তাঁকে আটকাতে পারেনি । দারুণ সুনামের সাথে পার হয়ে গেছেন ক্লাসের পর ক্লাস। স্কুলের পর কলেজ, কলেজের পর বিশ্ববিদ্যালয় ।

বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পড়াতেন পদার্থবিদ্যা । তার শেষ পরীক্ষা যখন দেন, তখনই পেয়ে যান অধ্যাপনার কাজ । ফল্ বেরুনোর আগেই । শুধু ভালো ছাত্র ছিলেন বলে ।

আজব কথা, পরে কিন্তু তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন পরিসংখ্যান বিভাগে—পরিসংখ্যান নিয়ে গবেষণা করেই তিনি ডক্টরেট পান । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই বিভাগটি বলতে গেলে তাঁরই হাতে গড়া । পরিসংখ্যানে তাঁর জ্ঞান এমনি গভীর ছিলো যে, ভারতের একটি বিশ্ববিদ্যালয় গোছের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনেক দিন তাঁকে অতিথি অধ্যাপক করে রেখেছিলো । তিনি মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে পড়িয়ে আসতেন ।

আবার দেখো আর এক কাণ্ড । পরিসংখ্যান হল অঙ্কের ব্যাপার । লোকে বলে, অঙ্কের সাথে শিল্প-সাহিত্যের বনিবনাও নেই । কিন্তু কাজী মোতাহার হোসেন অল্প বয়স থেকেই সাহিত্যের সাধনাও করেছেন দারুণ উৎসাহ নিয়ে । ফলে, পরে তিনি হন এদেশের সেরা প্রবন্ধকারদের একজন । সত্যি বলতে কি, অনেকেই তাঁকে এখন জানে কেবল সাহিত্যিক বলে ।

এ সব গুণের জন্যে তিনি দেশের অনেক বড়ো বড়ো লোকের শ্রদ্ধা-ভালোবাসা পেয়েছেন । কবি নজরুল ছিলেন তাঁর একজন অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু । নজরুল তাঁকে আদর করে 'মোতিহার' বলে ডাকতেন ।

এতো সত্ত্বেও তিনি ছিলেন ভারী সাদাদিধে মানুষ । যেমন চালচলনে, তেমনি

কথাবার্তায় আর পোশাক-আশাকে । অহঙ্কারের নাম-গন্ধও তাঁর ভেতর ছিলো না । সব সময় অতি সাধারণ পোশাক পরতেন, ছোটো-বড়ো সবার সাথেই মিশতেন দিলখোলাভাবে । মানুষের জন্যে তাঁর দরদও ছিলো খুব ।

এক সময় তাঁকে সাইকেলে চেপে চলাফেরা করতে দেখা যেতো । একখানা গাড়িও তিনি কিনেছিলেন । গাড়ির ড্রাইভারের সাথে তাঁর সম্পর্ক দেখা গেছে বন্ধুর মতো । মাঝে মাঝে পান খেতেন তিনি । বাইরে কখনো পান কিনলে একটা খেয়েছেন নিজে, একটা দিয়েছেন ড্রাইভারকে ।

আপনভোলা গোছের মানুষ ছিলেন বলে তিনি সব সময় আত্মীয়-স্বজন, চেনাজানা মানুষদের খবর রাখতে পারতেন না । এমনকি ভালো করে চিনতেও । একবার তো এই নিয়ে এক মজার কাণ্ডই ঘটে যায় । পথে তাঁর এক মেয়ের সাথে দেখা । মেয়ে বিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়িকা সনজীদা খাতুন, রিকশা নিয়ে তাঁরই কাছে আসছিলেন । কাজী সাহেবও কোথাও যাচ্ছেন । কিন্তু মেয়েকে দেখে তিনি থামলেন না, তাকে সসম্ভ্রমে সালাম জানিয়ে আপন পথে চলতে লাগলেন । পরে বাড়িতে এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে সনজীদা খাতুনের কথা হয়—আব্বা আপনি আমাকে এভাবে সালাম দিয়ে চলে গেলেন কেন ? আমি তো আপনার মেয়ে । কাজী সাহেব সব শুনে বললেন, ও । সে জন্যেই চেনা-চেনা মনে হচ্ছিলো ।

এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান । সেখানে কাজী মোতাহার হোসেনের পাশেই বসে আছেন কবি মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ । হঠাৎ এক সময় তিনি অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্রের ওপর লেখেন, অমুক লেখক কি বেঁচে আছে ? তারপর কার্ডখানা মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ সাহেবের দিকে বাড়িয়ে ধরেন ।

'অমুক লেখক' মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ সাহেবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু । তিনি কাজী সাহেবকে জানালেন, হ্যাঁ, তিনি বহাল তবিয়তেই বেঁচে আছেন । এবং আপনার বাসার কাছেই অমুক অফিসে কাজ করেন ।

কাজী মোতাহার হোসেন তারপর পয়লা মওকাতেই সেই লেখক ভদ্রলোকের অফিসে গিয়ে হাজির । কিন্তু দেখেন, অফিস বন্ধ । তা-কি ব্যাপার ? না, দিনটা রোববার, সাপ্তাহিক ছুটির দিন । কাজী মোতাহার হোসেন অতো হিসেব করে অফিসটায় যাননি ।

কিন্তু তিনি হিসেব না করলেও লেখক ভদ্রলোক করেন । পরদিন অফিসে গিয়ে তিনি যখন দারোয়ানের কাছে ঘটনাটা শোনেন । তাঁর এখন কাজী সাহেবের সাথে দেখা করা খুবই দরকার । প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর কাছে ছুটে গেলেন ।

এর কিছুদিন পর কাজী মোতাহার হোসেন আবার লেখক ভদ্রলোকের অফিসে গেলেন । সেদিন অফিস খোলা । কিন্তু লেখক নেই । তা এবারে কি ব্যাপার ? না, তাঁর ছেলের অসুখ। সেই জন্যে দু'দিনের ছুটি নিয়েছেন ।

ছুটি ফুরোলে লেখক অফিসে গিয়ে কাজী সাহেবের কথা শোনেন । এবারেও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর কাছে ছুটে যান । কাজী সাহেব কি জন্যে তাঁর অফিসে এসেছিলেন, তা জানতে । এবং দরকারী কথাবার্তার পর, আগের দু'দিন অফিসে তাঁর গরহাজির থাকার কারণটা কাজী সাহেবকে বলেন । কথায় কথায় ।

দিন কয়েক পর আবার দুজনের দেখা । তখন কাজী মোতাহার হোসেন লেখককে বলেন, তোমার ছেলে এখন কেমন আছে ? আমি দু'রাকাত নফল নামায পড়ে তার জন্যে দোয়া করেছি ।

মানুষের জন্যে ছিলো তাঁর এমনি দরদ ।

এদিকে, গুণীজনের জন্যে ছিলো তাঁর অসীম শ্রদ্ধা ।

১৯৫৪ সালের কথা । ওস্তাদ আলাউদ্দীন খান এসেছেন ঢাকায় । থাকছেন বর্ধমান হাউসে। এখন যেটা বাংলা একাডেমীর পুরোনো এবং প্রথম বাড়ি । একদিন কাজী মোতাহার হোসেন গেলেন তাঁর সাথে দেখা করতে । কাজী সাহেব ভেতরে ঢুকতেই তিনি উঠে দাঁড়ান । তারপর দেখবার মতো এক দৃশ্য । দুজনেই যান দুজনের কদমবুসি করতে । মানে কিনা— দুজনেই দুজনকে ধরে নিয়েছেন মুরুব্বী বলে । তাই কেউ কারো কদমবুসি নিতে রাজি নন, রাজি শুধু কদমবুসি করতে । তার ফলে দুই বৃদ্ধে শুরু হয়ে যায় রীতিমতো ধস্তাধস্তি !

শেষ পর্যন্ত অবশ্যি কেউ কারো কদমবুসি করতে পারেন নি । ধস্তাধস্তিতে ক্ষান্ত দিয়ে দুজনেই বসে পড়েন । শুরু করেন কথাবার্তা ।

ওস্তাদ আলাউদ্দীন খান বলেন, সারাটা জীবন গান-বাজনা নিয়ে কাটিয়েছি । কিন্তু কিছুই বুঝিনি । শুধু এখন মনে হয়, একটু একটু বুঝি।

তাঁর বয়স তখন আশির ওপর ।

কাজী সাহেব তাঁর কথা শুনে বললেন, আমিও তো সারা জীবন দাবা খেললাম । কিন্তু আগে কিছু বুঝিনি । এখন যেন একটু একটু বুঝি।

তোমাদের বলে না দিলেও চলবে, তাঁদের কথাগুলোর মানে হল ঃ সাধনা ছাড়া কখনো বড়ো হওয়া যায় না । আর সাধনার কোনো শেষ নেই ।

ভালো কথা । একটা জিনিস তোমাদের বলতে ভুলে গেছি । সেটা অবশ্যি তোমরাও জানো । তিনি ছিলেন আমাদের দেশের সেরা এবং অতি উচুঁ দরের দাবা

খেলোয়াড় । দাবা খেলায় সারা দুনিয়াতেই তাঁর নাম ছিলো । নিয়াজ মোর্শেদ আমাদের কাছে যেমন গর্বের পাত্র, কাজী মোতাহার হোসেনও তেমনি । তোমরা নিশ্চয়ই জানো, তাঁর নামে আমাদের দেশে একটি নিয়মিত দাবা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে ।

কাজী মোতাহার হোসেনের আর একটি বড়ো গুণ ছিলো— ভালো কাজে তরুণদের উৎসাহ দেওয়া । যার ভেতর যতোটুকু ভালো গুণ আছে, তা তুলে ধরা, তার বিকাশে যতো দূর সম্ভব সাহায্য করা ।

এরও একটা প্রমাণ আমি নিজে পেয়েছি ।

একবার খুলনা থেকে এক তরুণ নাট্যকার তাঁর একখানি নাটকের পাণ্ডুলিপি কাজী সাহেবের কাছে পাঠান । তাঁর মতামত জানবার জন্যে । পাণ্ডুলিপিটা পাওয়ার পর কাজী সাহেব একদিন আমাকে বললেন, তুমি এটা একটু দেখে দিয়ো তো, কেমন হয়েছে ।

তাঁর মতো মানুষ আমাকে পাণ্ডুলিপি দেখে দিতে বলছেন । আমার তাই মনে একটা ভাব এসে গেল, আমি কেউকেটা । মতামত জানাতে হবে । সুতরাং পাণ্ডুলিপিটা পড়ে ফেললাম । কিন্তু সে পড়া যেন পরীক্ষকের পড়া ! না, তার থেকেও বেশি। আমার দেওয়া দাগদাগালিতে পাণ্ডুলিপি ভরে গেল । শুধু কি তা-ই ? যেখানেই খারাপ লাগলো, খারাপ খারাপ মন্তব্যও লিখে ফেললাম সেখানে । একটিবারও ভাবলাম না, আমি পাণ্ডুলিপিটা নষ্ট করছি, লেখককে হয়তো আবার কপি করতে হবে ।

তারপর পাণ্ডুলিপিটা কাজী সাহেবের হাতে ফেরত দিয়ে বলি, বাজে লেখা । কিছুই হয়নি ।

তিনি পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে দেখলেন । মাঝে মাঝে পাতা উলটে ।

তারপর—তাঁর স্বভাব ছিলো আস্তে আস্তে কথা বলা, তেমনি করে এক সময় আমাকে বললেন, দেখো, লেখক অনেক আশা নিয়ে পাণ্ডুলিপিটা পাঠিয়েছে । একটু উৎসাহ দেওয়া দরকার । এর ভেতর কিছু ভালো জিনিসও নিশ্চয়ই আছে । সেগুলোকেই বড়ো করে দেখা উচিত । যেসব জায়গা তোমার ভালো লাগেনি, সেগুলোর কথা আলাদা কাগজে লিখে সংশোধনের জন্যে মতামত দিতে পারতে । তাতে পাণ্ডুলিপিটা নষ্ট হত না, লেখকও উৎসাহ পেত ।